ইসলামী ব্যাংকিং

একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিং

একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিং
একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা
অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

প্রকাশনায়
জনসংযোগ বিভাগ
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ১৯৯৬

প্রচ্ছদ
এম. মমিনুল হক

মুদ্রণে
আঞ্জুমান প্রিন্টিং প্রেস
৩২, যোগীনগর, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩

মূল্যঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Islami Banking : Ekty Unnatatar Bank Babostha (Islami Banking : A Superior Banking System). Written by Prof. Muhammad Sharif Hussain. Published by Public Relations Department, Islami Bank Bangladesh Limited, 66, Dilkusha Commercial Area, Dhaka, Bangladesh. 1st Edition : October 1996. Cover designed by M. Mominul Haque.

www.pathagar.com

ভূমিকা

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন প্রণীত "ইসলামী ব্যাংকিং ঃ একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা" বইটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। সমকালীন বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এর ইনসাফপূর্ণ কার্যক্রম ও সাফল্য আধুনিক অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

আজ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সুদের উপর ভিত্তিশীল লেনদেন ও কায়-কারবার জনজীবনে নানা ধরনের অর্থনৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে ও বিপর্যয় ঘটায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। এই প্রেক্ষাপটে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপযোগিতা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এক যুগের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, এ ব্যাংক ব্যবস্থা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা অর্থাৎ ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে সমাজের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্থিতিশীলতার উপাদান হিসাবে কাজ করে।

বাংলাদেশে প্রায় এক যুগ ধরে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে দেশে বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠিত চারটি ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদের গ্রাহক সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি, কার্যক্রম এবং বিভিন্ন কল্যাণমুখী ভূমিকার উপর আলোকপাত করে অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন এই বইটি রচনা করেছেন। বইটিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানপিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবসহ গবেষকদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার খোরাক রয়েছে বলে মনে করি।

আশা করি এই বইয়ের বহুল প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপযোগিতা উপলব্ধি করে এর বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন।

কমোডর মোহাম্মদ আতাউর রহমান (অবঃ)
চেয়ারম্যান
বোর্ড অব ডাইরেক্টরস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

www.pathagar.com

লেখকের কথা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে 'ইসলামী ব্যাংকিং ঃ একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা' প্রকাশিত হলো। এজন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সুদ-নির্ভর আধুনিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে সমসাময়িক বিশ্বে অভূতপূর্ব সাফল্যের সোপান রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সুদ-নির্ভর অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে পুঁজি সংগঠক ও ধনবানদের শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে। এরই প্রতিক্রিয়ায় কম্যুনিজমের আবির্ভাব ঘটেছিল যা সামাজিক শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতন ও পুঁজিবাদী বিশ্বের শোষণ ব্যবস্থা আরো শাণিত হয়েছে। বিপর্যস্ত মানবতার আর্তনাদকে করে তুলেছে আরো তীব্র।

এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক বিশ্বের চিন্তাজগতে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের অপরিহার্যতা প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা ইসলামেই মানব জীবনের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে অর্থনীতি ক্ষেত্রেও যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, তাতে সম্পদের সুষম বন্টন, শোষণের অবসান, ধন-বৈষম্যের অপনোদন এবং আর্থ-সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব।

চলতি শতকের ৬০-এর দশক থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক মানচিত্রে সুদমুক্ত ইসলামী শরীয়তসম্মত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী দুই শ'রও অধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র মুসলিম দেশেই নয়, অনেক অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার জনপ্রিয়তারই প্রমাণ দেয়। ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যের প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদগণ সুদের শূন্যহার প্রবর্তনের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন।

ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র ব্যবসা ও মুনাফা অর্জনকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেনি, সমাজের প্রতি এর দায়বদ্ধতার উপরও যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম করা ; অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জন করা ; আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন

www.pathagar.com

নিশ্চিত করা এবং মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন করা। এ ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো রিবা বা সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা।

স্বভাবতঃই কল্যাণকামী ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রযাত্রায় সাধারণ মানুষের মনে কৌতুহল ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কে তেমন কোন বই না থাকায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে এদেশে মিশ্র ধারণা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিভ্রান্তি।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের একটি বই রচনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করে। আমি আমার সীমিত জ্ঞান ও পড়াশুনার আলোকে সাধ্যমত দায়িত্ব পালনে যত্নবান হয়েছি। এই পুস্তক প্রণয়নে অকৃপণভাবে সাহায্য–সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে যাঁরা ঋণী করেছেন, পুস্তকটি প্রকাশকালে তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. আযীযুল হক, ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া কাউন্সিলের সদস্য–সচিব প্রিন্সিপ্যাল কামালুদ্দীন জাফরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্ণর জনাব এ. এস. এম. ফখরুল আহসান এবং ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বগুড়া জোনের প্রধান জনাব মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম এ বই প্রণয়নকালে পাণ্ডুলিপি দেখে ও সংশোধনসহ বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। একই সাথে বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে, বিশেষ করে ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস–এর চেয়ারম্যান কমোডর মোহাম্মদ আতাউর রহমান (অবঃ), এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মীর কাশেম আলী, এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট জনাব এম. কামালউদ্দিন চৌধুরী এবং জনসংযোগ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব শাহ্ আবদুল হালিম ও জনাব মোঃ আতাউর রহমানকে ধন্যবাদ জানাই।

সুধী পাঠক–পাঠিকাবৃন্দ সাদরে এই বইটি গ্রহণ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। একই সাথে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকটির আরো উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। এ বইয়ের জন্য যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'লার এবং এর ত্রুটি–বিচ্যুতির জন্য দায়ভার আমার। এজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই কর্মোদ্যোগকে কবুল করুন এবং বিশ্বে তাঁর প্রদত্ত জীবন–বিধান বাস্তবায়নে তৌফিক দান করুন। আমিন।

মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সম্মানিত ডাইরেক্টর অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন প্রণীত "ইসলামী ব্যাংকিং ঃ একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা" শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কিত পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। কারণ এ দেশে এক যুগেরও অধিককাল ধরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সফলতার সাথে তার কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে এ ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক কিভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে, আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে, প্রচলিত ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের পার্থক্য কি, বর্তমান ব্যবস্থায় দুই ধারার ব্যাংকের মধ্যে কি ভাবেই বা সম্পর্ক রক্ষিত হয়-এ ধরনের ঔৎসুক্য মেটানোর উপযোগী কোন বই বাংলা ভাষায় নেই। এ ক্ষেত্রে এই বই পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদা কিছুটা হলেও নিবৃত্ত করতে পারবে বলে আমরা আশা রাখি।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় রচিত এটি সম্ভবতঃ প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যেখানে এ ব্যবস্থার তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর পাশাপাশি এর প্রায়োগিক বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বই অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের কর্মীরা উপকৃত হবেন, একই সাথে ব্যাংকের গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, ছাত্র, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও গবেষকদের চিন্তা-জগতে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটবে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন আমাদের অনুরোধে এ বই প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ বই পাঠ করে সংশ্লিষ্ট সবাই উপকৃত হবেন। আল্লাহ পাক আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

এম. কামালউদ্দিন চৌধুরী
এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পটভূমি **১৫-২৫**

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য **২৬-৩৫**

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ২৬

১. সুদ বর্জন করা
২. মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা
৩. শরীয়ত নির্দেশিত হালাল কারবারে বিনিয়োগ করা
৪. হালাল পন্থা–পদ্ধতি অনুসরণ করা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি ২৭

১. তৌহিদ ও রবুবিয়াত
২. খিলাফত ও রিসালাত
৩. আখিরাত

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ৩১

১. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম করা
২. অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জন করা
৩. আর্থ–সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা
৪. মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন করা

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য ৩৩

১। রিবা বা সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি
২। বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণ
(ক) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (খ) অংশীদারী বিনিয়োগ
৩। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সুদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী **৩৬-৪৫**

সুদের সংজ্ঞা ৩৬

সুদের বৈশিষ্ট্য ৩৭

www.pathagar.com

সুদের শ্রেণী বিন্যাস ৩৭
১. রিবা নাসিয়া
২. রিবা ফদল

মুনাফার সংজ্ঞা ৩৯

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য ৪০

ইসলামে সকল প্রকার সুদই নিষিদ্ধ ৪২

সুদ সম্পর্কে কুরআন–সুন্নাহর ঘোষণা ৪৩

অন্যান্য ধর্ম ও দার্শনিক দৃষ্টিতে সুদ ৪৪

চতুর্থ অধ্যায় ঃ সুদের কুফল ৪৬-৬৮

সুদের সামাজিক ও নৈতিক কুফল ৪৬

১. সুদ স্বার্থপরতা ও কার্পণ্য সৃষ্টি করে
২. সুদ ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে
৩. সুদ নৈতিক অবক্ষয় সাধন করে

সুদের অর্থনৈতিক কুফল ৪৭

ক. সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের উপর সুদের প্রভাব ৪৮

১. সুদ সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনে বাধা সৃষ্টি করে ২. সুদ বিনিয়োগ কমিয়ে দেয় ৩. সুদ বিনিয়োগকে অনুৎপাদনশীল ফটকা খাতে ঠেলে দেয় ৪. সুদ পুঁজিকে অলস রাখতে উৎসাহিত করে ৫. সুদ দীর্ঘমেয়াদী ও ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ কমিয়ে দেয় ৬. সুদ সঞ্চয়কারীদের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে ৭. সুদ উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে ৮. সুদ পুঁজির দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দে বাধা সৃষ্টি করে ৯. সুদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে ১০. সুদ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে ১১. সুদ চাহিদা হ্রাস করে ১২. সুদ সম্পদ ধ্বংস করতে বাধ্য করে

খ. বন্টনের উপর সুদের প্রভাব ৫৭

১. উৎপাদন উপাদানসমূহের মধ্যে আয়–বন্টনে সুদের প্রভাব

(ক) সুদ বেকার ও আয়হীন লোকের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় (খ) সুদ শ্রমকে ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে (গ) সুদ পুঁজিপতির সম্পদকে ফাঁপিয়ে তোলে (ঘ) সুদ সংগঠনের উপর জুলুম চাপিয়ে দেয় (ঙ) সুদ ভূমিকে ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে

২. সার্বিক বন্টনে সুদের প্রভাব ৬০

(ক) সুদ পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে (খ) সুদ জমাকারীদের আয় কমিয়ে দেয় (গ) সুদ ভোক্তাদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত করে (ঘ) সুদ জনগণের সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জিভূত করে (ঙ) সুদ উদ্যোক্তা ও ধনীর সংখ্যা কমিয়ে দেয়

www.pathagar.com

গ. স্থিতিশীলতার উপর সুদের প্রভাব ৬৩

১. সুদ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় ২. সুদ মুদ্রানীতিকে বিকল করে দেয় ৩. সুদ মন্দা সৃষ্টি করে ৪. সুদ শেয়ার বাজারে ফটকা কারবারের সৃষ্টি করে ৫. সুদ পণ্য বাজারে ফটকা কারবারের জন্ম দেয় ৬. সুদ বিনিময় হারকে অস্থির করে তোলে

সুদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কুফল ৬৭

১. সুদ ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে
২. সুদ বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করে

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস ৬৯-৭২

১. পরিশোধিত মূলধন
২. সংরক্ষিত তহবিল
৩. অন্যান্য সঞ্চিতি ও অবন্টিত মুনাফা
৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ
৫. অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ
৬. ইসলামী অর্থায়ন-পত্র বিক্রয়
৭. জনগণের গচ্ছিত আমানত
৮. যাকাত

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী ৭৩-১০০

১. সঞ্চয় সমাবেশ ৭৪

১। আল-ওয়াদিয়াহ্ হিসাব
২। সাধারণ মুদারাবাহ্ হিসাব
৩। মেয়াদী মুদারাবাহ্ হিসাব
৪। বিশেষ মুদারাবাহ্ হিসাব
৫। বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ্ হিসাব

২. বিনিয়োগ ৮০

১। মুদারাবাহ্ বিনিয়োগ
২। মুশারাকাহ্ বিনিয়োগ
৩। শেয়ার বিনিয়োগ
৪। সরাসরি বিনিয়োগ
৫। বাই-মোয়াজ্জাল

www.pathagar.com

৬। বাই–মুরাবাহা
বাই–মোয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতির শর্তাবলী
৭। বাই–সালাম
বাই–সালাম পদ্ধতির শর্তাবলী
৮। ইজারা
(১) আর্থিক ইজারা (২) ব্যবহারিক ইজারা
৯। ইজারা বিল–বাই
(১) ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্ব পদ্ধতি (২) ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া পদ্ধতি
১০। বিনিয়োগ নিলাম
১১। স্বাভাবিক মুনাফার হার
১২। পারস্পরিক সম–প্রডাক্ট ঋণ ব্যবস্থা
১৩। সেবা–মূল্যের বিনিময়ে ঋণ দান
১৪। পণ্য–ব্যবসা
১৫। কমিশন বা লাভের ভিত্তিতে সরবরাহ ব্যবসা

৩. অন্যান্য কাজ ৯৩

১। সেবা–মূল্য বা কমিশনের বিনিময়ে প্রদত্ত সেবা
(ক) আভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স (খ) অর্থ কালেকশন (গ) ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান
(ঘ) আভ্যন্তরীণ এলসি খোলা (ঙ) লকার ভাড়া দান
২। বিনামূল্যে দেয় সেবা

৪. সমাজকল্যাণমূলক কাজ ৯৫

১। করজে হাসানা প্রদান
২। যাকাত প্রদান

৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময় ৯৫

আন্তঃব্যাংক সম্পর্ক ৯৫

১। সমঝোতার ভিত্তিতে বিনা সুদে পরস্পরের কাজ করা
২। পারস্পরিক সম–প্রডাক্ট ঋণ ব্যবস্থা
৩। আল–ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব সংরক্ষণ
৪। মুদারাবাহ ভিত্তিতে পরস্পর আমানত সংরক্ষণ

আমদানী বাণিজ্য ৯৮

ঋণপত্র খোলা
(ক) একশ' ভাগ মার্জিনে এলসি (খ) আংশিক মার্জিনে এলসি (গ) শূন্য মার্জিনে এলসি

www.pathagar.com

রপ্তানী বাণিজ্য ৯৯

রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন

(ক) মুশারাকাহ (খ) মুদারাবাহ (গ) বাই-সালাম

অর্থ আদান-প্রদান ১০০

১। বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়
২। ট্র্যাভেলার্স চেক
৩। আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান
৪। বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব

সপ্তম অধ্যায় ঃ শরীয়ত বোর্ড ১০১-১০২

শরীয়ত বোর্ডের গঠন ১০১

বিভিন্ন ব্যাংকের শরীয়ত বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় ১০২

অষ্টম অধ্যায় ঃ মুদারাবাহ কারবারের শরয়ী বিধান ১০৩-১১২

মুদারাবাহ কারবারের সংজ্ঞা ১০৩

মুদারাবাহ কারবারের ধরন ১০৪

১। সাধারণ মুদারাবাহ ২। বিশেষ মুদারাবাহ
৩। মেয়াদী মুদারাবাহ ৪। বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ

মুদারাবাহ কারবারের শর্তাবলী ১০৫

১। চুক্তি
২। পুঁজি সরবরাহ
৩। লাভ-লোকসান বন্টন

(ক) মুনাফার অংশ নির্ধারণ (খ) লোকসানের দায় বহন (গ) লাভ-লোকসান নিরূপণ ও বন্টন

৪। সাহিব আল-মালের পুঁজি প্রত্যর্পণ
৫। কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

(ক) নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ (খ) মুদারাবাহ ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে সংগৃহীত পুঁজি বিনিয়োগ (গ) মুদারাবাহ কারবারে মুশারাকাহ ভিত্তিতে সংগৃহীত পুঁজি বিনিয়োগ (ঘ) মুদারাবাহ অর্থ ভিন্ন মুদারাবাহ কারবারে বিনিয়োগ

মুনাফা গ্রহণে মধ্যস্থতাকারীর অধিকার

(ঙ) মুদারাবাহ তহবিল মুশারাকাহ ভিত্তিতে বিনিয়োগ (চ) ঋণ গ্রহণ ও ঋণ দান
(ছ) ব্যক্তিগতভাবে ঋণ গ্রহণ ও মুদারাবাহ
কারবারে বিনিয়োগ (জ) ধারে ক্রয়-বিক্রয়

৬। মুদারাবাহ কারবারে আর্থিক দায়
৭। মুদারাবাহ চুক্তির সমাপ্তি

www.pathagar.com

নবম অধ্যায় ঃ মুশারাকাহ কারবারের শরয়ী বিধান **১১৩-১২১**

মুশারাকাহ্ কারবারের সংজ্ঞা ১১৩

মুশারাকাহ্ কারবারের শ্রেণী ১১৩

১. শিরকাতুল মিল্ক
(ক) শিরকাতুল মিল্ক বিল এখতিয়ার (খ) শিরকাতুল মিল্ক বিল জাবার

২. শিরকাতুল উকুদ
(ক) শিরকাতুল মুফাবাদা (খ) শিরকাতুল ইনান (গ) শিরকাতুল আবাদান বা সানাই
(ঘ) শিরকাতুল উজুহ্

মুশারাকাহ্ কারবারের শর্তাবলী ১১৫

১। চুক্তি

২। লাভ–লোকসান বন্টন
(ক) মুনাফার অংশ নির্ধারণ (খ) লোকসান বহন (গ) লাভ–লোকসান নিরূপণ ও বন্টন (ঘ) অংশীদারদের পুঁজি প্রত্যর্পণ

৩। কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা
(ক) স্বাভাবিক কাজ ও লেনদেন (খ) অংশীদারকে কাজের বিনিময়ে বেতন–ভাতা প্রদান (গ) মুশারাকাহ ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ (ঘ) মুদারাবাহ ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ (ঙ) মুশারাকাহ তহবিল ভিন্ন মুশারাকাহ চুক্তিতে বিনিয়োগ (চ) মুশারাকাহ তহবিল মুদারাবাহ চুক্তিতে বিনিয়োগ (ছ) অংশীদারের নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ (জ) ঋণ গ্রহণ ও ঋণ দান (ঝ) ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ ও মুশারাকাহ্ কারবারে বিনিয়োগ (ঞ) বাকীতে ক্রয়–বিক্রয়

৪। অংশীদারদের আর্থিক দায়

৫। মুশারাকাহ্ কারবারের সমাপ্তি

দশম অধ্যায় ঃ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব **১২২-১৩৫**

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে
ঋণের বাজার বিলুপ্ত হয়
মূলধনের ব্যয় শূন্য হয়
সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি বৃদ্ধি পায়
বিনিয়োগ বরাদ্দ দক্ষতাপূর্ণ হয়
ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বেশী হয়

www.pathagar.com

বিনিয়োজিত পুঁজি আদায় সহজতর হয়
বেকার সমস্যা হ্রাস পায়
সম্পদ ও আয়-বন্টন ইনসাফপূর্ণ হয়
মুদ্রাস্ফীতি কমে আসে
অর্থনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পায়
প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়
আঘাত মুকাবিলা সহজ হয়

একাদশ অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক **১৩৬-১৫৩**
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

প্রতিষ্ঠা ১৩৬
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১৩৭
বৈশিষ্ট্য ১৩৭
ব্যবস্থাপনা ১৩৮
মূলধন ১৩৮
কার্যক্রম ১৩৯
সঞ্চয় সমাবেশ ১৩৯

১. আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব
২. মুদারাবাহ হিসাব
(ক) মুদারাবাহ বিশেষ নোটিশ আমানত (খ) মুদারাবাহ সঞ্চয়ী হিসাব
৩. মুদারাবাহ মেয়াদী হিসাব
৪. মুদারাবাহ হজ্ব সঞ্চয়ী আমানত
লাভ-লোকসান বন্টন পদ্ধতি

বিনিয়োগ ১৪৩

১. বাই-মোয়াজ্জাল চুক্তিতে বিক্রয়
২. বাই-মুরাবাহা চুক্তিতে বিক্রয়
৩. বাই-সালাম
৪. ভাড়ায় ক্রয়
(ক) ক্রমহ্রাসমান মালিকানা (খ) ভাড়ার চুক্তিতে ক্রয়
৫. ইজারা বা লীজ
৬. মুশারাকাহ বা অংশীদারী বিনিয়োগ
৭. বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়
৮. করজে হাসানা

www.pathagar.com

অন্যান্য কাজ ১৪৬
বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় ১৪৭

১। আমদানী
২। রপ্তানী
৩। রেমিট্যান্স
৪। বিবিধ কাজ
চেক ও বিল কালেকশন
ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু, ক্রয় ও বিক্রয়
ট্যুরিস্ট অথবা ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক মুদ্রা ভাঙ্গিয়ে দেয়
পবিত্র হজ্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম
আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু
বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব
বিদেশী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক

কল্যাণমূলক বিনিয়োগ প্রকল্প ১৪৮

১। ক্ষুদ্র যানবাহন প্রকল্প (আয় থেকে দায় শোধ) ২। ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প ৩। ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প ৪। কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ৫। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৬। গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প ৭। গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প ৮। হকার বিনিয়োগ প্রকল্প ৯। পোলট্রি বিনিয়োগ প্রকল্প

শরীয়া কাউন্সিল ১৪৯

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ১৫০

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
প্রকল্প পরিচিতি

১. আয়-বর্ধন প্রকল্প ২. বিক্রয় কেন্দ্র (মনোরম) ৩. শিক্ষা প্রকল্প ৪. স্বাস্থ্য প্রকল্প ৫. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রকল্প ৬. মানবিক সাহায্য প্রকল্প ৭. জরুরী রিলিফ তৎপরতা ৮. সার্ভিস সেন্টার ৯. মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ১০. দাওয়াহ কর্মসূচী

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সমস্যা ১৫২

১. উপযোগী আইনের অভাব
২. বীমা সুবিধার অভাব
৩. ইসলামী সিকিউরিটি ও বন্ডের অভাব
৪. দক্ষ জনশক্তির অভাব

পরিশিষ্ট : তথ্যপঞ্জী **১৫৪-১৬২**

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পটভূমি

'ইসলামী ব্যাংকিং' পরিভাষাটি সাম্প্রতিক কালের উদ্ভাবন। চলতি শতকের শুরুতেও ইসলামী ব্যাংকিং শব্দের সাথে বিশ্ব পরিচিত ছিল না। ইতিপূর্বে ব্যাংকিং বলতে শুধুমাত্র বিশ্বজুড়ে প্রচলিত সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝাতো। বস্তুবাদী সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের সমসাময়িক কালে পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। অতঃপর ইউরোপের রাজনৈতিক বিজয়ের সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুদী ব্যাংক ব্যবস্থাও ছড়িয়ে পড়ে; এমনকি মুসলিম দেশগুলোও সুদী ব্যবস্থা থেকে অব্যাহতি পায়নি।

কিন্তু সময়ের গতির সাথে মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনে পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার ব্যর্থতা ক্রমে প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠলো। এ ব্যবস্থা আর্থিক সম্পদ বন্টনে মারাত্মক অদক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে একদিকে বিশ্বের উৎপাদন ব্যাহত করলো, অপরদিকে সম্পদ ও আয়ের বন্টন ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ব-মানবতাকে কিছুসংখ্যক বিত্তশালী ও অগণিত বিত্তহীনের শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিলো। দিকে দিকে প্রজ্জ্বলিত হলো শ্রেণী সংঘাতের বিষাক্ত অগ্নিশিখা। এছাড়া এ ব্যবস্থা অর্থনীতিতে দারুণ অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বকে চরম সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিলো। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বময় সৃষ্ট সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে পশ্চিমা অর্থনীতিবিদগণও আঁতকে উঠলেন। তাঁরা সুদের কুফল সম্পর্কে কেবল সোচ্চারই হলেন না, বরং সুদ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে শুরু করলেন। বিশ্ব অর্থনীতির এমনি সংকটের প্রেক্ষাপটে ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সামনে রেখে শুরু হয় সুদমুক্ত মুনাফা ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং-এর চিন্তা-ভাবনা, যা আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাস্তব রূপ লাভ করেছে এবং দক্ষ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অনন্য দিশারী হিসেবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

এখানে বলা দরকার, মুসলিম চিন্তাবিদগণ সুদী ব্যাংকের বিষময় পরিণাম সম্পর্কে কখনো নীরব থাকেননি। প্রথম থেকেই তাঁরা সুদের বিরোধিতা করে আসছেন এবং ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে লেনদেন ও কায়-কারবার পরিচালনার উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁরা কখনো বলিষ্ঠ ও জোরালোভাবে আবার কখনো বা ধীর-মন্থর গতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ইসলামীকরণের কথা বলে এসেছেন। তবে চলতি শতকের প্রথমার্ধ থেকে এ আন্দোলনে এক নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। এ শতকের ত্রিশের দশকে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বইপত্র লেখা হয়। ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষাগুলো সম্ভবতঃ এ সময় থেকেই পরিচিতি লাভ

www.pathagar.com

করতে শুরু করে। এসব বইপত্র মুসলিম চিন্তাশীল মহলে বিশেষ সাড়া জাগায় এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা ও লেখালেখি শুরু হয়।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে এসে এ আন্দোলন আরো বেগবান হয়ে ওঠে। এ সময়ে বেশ ক'টি মুসলিম দেশ দীর্ঘ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এসব দেশের শাসনভার মুসলিম অধিবাসীদের হাতে ন্যস্ত হয়। এসব দেশে মুসলমানদের নিজস্ব আদর্শ ও ঐতিহ্যের আলোকে অর্থনীতি, ব্যাংকিং তথা গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর দাবী উঠতে থাকে এবং ক্রমে সে দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ব্যাপকতা লাভ করে এবং বহুসংখ্যক বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়। অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, এমনকি ইউরোপ-আমেরিকাতেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৬২ সালে সর্বপ্রথম মালয়েশিয়ায় 'পিলগ্রিমস সেভিংস করপোরেশন' নামে একটি ইসলামী সংস্থা কায়েম করা হয়। অবশ্য ১৯৬৩ সালে মিশরে আধুনিক বিশ্বের প্রথম ইসলামী ব্যাংক কায়েম করা হয়। রাজধানী নগরী কায়রো থেকে মাত্র একশ' কিলোমিটার দূরে মিটগামার নামক স্থানে 'সেভিংস ব্যাংক' নামে এ ব্যাংক কাজ শুরু করে। ডঃ আহ্‌মদ আল-নাজ্জার ছিলেন এ ব্যাংকের চিন্তানায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা। অতি স্বল্প সময়ে এ ব্যাংক বিপুল সাফল্য অর্জন করে। এরপর পাকিস্তানেও অনুরূপ একটি উদ্যোগ নেয়া হয়।

আধুনিক বিশ্বে সরকারী উদ্যোগে প্রথম ইসলামী ব্যাংক কায়েম করা হয় মালয়েশিয়ায়। ১৯৬৯ সালে পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে 'তাবুং হাজী' নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক কায়েম করা হয়। হজ্ব-পালনেচ্ছু লোকদের আমানত সমাবেশকরণ এবং হাজীদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করাই হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে 'জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক'-এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৭০ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সৌদি আরবের তদানীন্তন বাদশাহ্‌ ফয়সল মুসলিম দেশগুলোর ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়তের আলোকে পুনর্গঠিত করার আহবান জানান। ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর ওআইসি-র অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (আইডিবি) নামে মুসলিম দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে ইসলামী অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে এ ব্যাংকের সনদ স্বাক্ষর করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর, ১৩৯৫ হিজরীর ১৪ শাওয়াল তারিখে জেদ্দা নগরীতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক কাজ শুরু করে।

www.pathagar.com

এছাড়া ১৯৭১ সালে মিশরে 'নাসের সোশ্যাল ব্যাংক' নামে আরো একটি ইসলামী ব্যাংক কায়েম করা হয়। ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাইয়ে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক', ১৯৭৭ সালে সুদানে 'ফয়সল ইসলামী ব্যাংক', কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ' এবং মিশরে 'ফয়সল ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৮ সালে জর্দানে 'জর্দান ইসলামী ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট' নামে একটি ব্যাংক স্থাপন করা হয়। ১৯৭৭ সালে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকের সমন্বয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস' (আইএআইবি) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের নীতিমালা ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় পরামর্শ ও টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। পাকিস্তান ও ইরানের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানোর ঘোষণা এ সময়েই দেয়া হয়। ১৯৮১ সালে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বক্তৃতাকালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মুসলমানদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যাংক ব্যবস্থা কায়েমের প্রস্তাব করেন।

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়া ও তুরস্কে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বছরই বাংলাদেশে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে ইরান এর সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতিমালার আলোকে পুনর্গঠন করে। পাকিস্তান ও সুদানের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ এ দশকেই করা হয়। এ ছাড়া ১৯৯৩ সালে মালয়েশিয়া এর গোটা আর্থিক ব্যবস্থা ইসলামীকরণের কথা ঘোষণা করেছে।

এভাবে নব্বই-এর দশক শুরু হবার পূর্বেই বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিম বিভিন্ন দেশে একশতেরও বেশী ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। আর এসময়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শাখার সংখ্যা দশ হাজারের কোঠা ছাড়িয়ে যায়।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক রূপলাভে সক্ষম হয়েছে। শুধু তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলোতেই নয়, অনেক দরিদ্র দেশেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হতে চলেছে। তাছাড়া অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এ যাবত তেল-সমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহে যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক কায়েম হয়েছে, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক ব্যাংক কায়েম হয়েছে অন্যান্য দেশে। উদাহরণস্বরূপ সুদান, মিশর, পাকিস্তান, জর্দান, লুক্সেমবার্গ, যুক্তরাজ্য, এমনকি বাংলাদেশের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্য। এ থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে ব্যাংকের ইসলামী মডেল সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতা লাভে সমর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক

বিশ্বে এযাবত স্থাপিত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহের নাম, দেশ ও প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করে একটি তালিকা এখানে দেয়া হলো।

দেশ এবং ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠাকাল
আফগানিস্তান	
১. ইসলামিক ব্যাংক আফগানিস্তান	১৯৯৩
আলজেরিয়া	
২. ব্যাংক আলবারাকা ডি আলজেরিয়া	–
আর্জেন্টিনা	
৩. ইসলামিক প্যান-আমেরিকান ব্যাংক	–
বাহামাস	
৪. দার আল-মাল আল-ইসলামী ট্রাস্ট	–
৫. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড	১৯৭৭
৬. আফ্রিকান-আমেরিকান ইসলামিক ব্যাংক	–
৭. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহামাস লিমিটেড	১৯৭৯
৮. মাসরাফ ফয়সল আল-ইসলামী (ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট) বাহামাস লিঃ	–
৯. ইসলামিক তাকাফুল এন্ড রি-তাকাফুল কোম্পানী লিমিটেড	–
১০. ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেডিং লিমিটেড	–
বাহরাইন	
১১. বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক বি. এস.	১৯৭৯
১২. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন	১৯৮৩
১৩. বাহরাইন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং	১৯৮০
১৪. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব দি গালফ	–
১৫. আরব ব্যাংকিং করপোরেশন	–
১৬. গালফ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক	–
১৭. আল-বারাকা ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বি এস সি (ই সি)	১৯৮৪
১৮. আরব ইসলামিক ব্যাংক	–
১৯. তাকাফুল ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	–

www.pathagar.com

২০. ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স এন্ড রি-ইন্স্যুরেন্স কোং	১৯৮৫
২১. মাশরিক ফয়সল আল-ইসলামিক	১৯৮২
বাংলাদেশ	
২২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৩
২৩. আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৭
২৪. আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
২৫. স্যোশাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
সাইপ্রাস	
২৬. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব সাইপ্রাস	-
২৭. কিবরিজ ইসলামিক ব্যাংক, কিফকোসা, নিকোশিয়া, তুর্কী সাইপ্রাস	-
২৮. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিজ লিঃ তুর্কী সাইপ্রাস	১৯৮২
ডেনমার্ক	
২৯. ইসলামিক ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল	১৯৮৩
জিবুতি	
৩০. ব্যাংক আল-বারাকা জিবুতি	-
মিশর	
৩১. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব ইজিপ্ট	১৯৭৭
৩২. ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১৯৮০
৩৩. নাসের সোশ্যাল ব্যাংক, মিশর	১৯৭২
৩৪. ইজিপ্সিয়ান সৌদী ফাইন্যান্স ব্যাংক	-
৩৫. ব্যাংক মিশর-ইসলামিক ব্রাঞ্চেস	১৯৮০
৩৬. আরব ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, কায়রো	-
৩৭. জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট কোং, কায়রো	-

www.pathagar.com

৩৮. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোং, কায়রো	–
জার্মানী	
৩৯. আল–বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, ফ্রাঙ্কফুর্ট	–
গিণি	
৪০. মাসরাফ ফয়সল আল–ইসলামী	১৯৮৩
৪১. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
৪২. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব গিণি	১৯৮৩
ভারত	
৪৩. আল–আমিন ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং	১৯৮০
৪৪. আমানাহ ব্যাংক, বাঙ্গালোর	–
৪৫. ইত্তেফাক ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, বোম্বে	–
৪৬. ফালাহ্ ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, বোম্বে	–
ইন্দোনেশিয়া	
৪৭. ব্যাংক মুয়ানামাত ইন্দোনেশিয়া	১৯৯২
৪৮. ব্যাংক শরীয়াহ	১৯৯৩
ইরান	
৪৯. ইসলামিক ব্যাংক, তেহরান	১৯৭৯
৫০. ব্যাংক মিল্লি ইরান	১৯৭৯
৫১. ব্যাংক মিল্লাত ইরান	১৯৭৯
৫২. ব্যাংক সাদারাত ইরান	১৯৭৯
৫৩. ব্যাংক সিপাহ	১৯৭৯
৫৪. ব্যাংক তেজারাত	১৯৭৯
৫৫. ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম	–
জর্দান	
৫৬. জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট	১৯৭৮

www.pathagar.com

৫৭. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট হাউজ	১৯৮১
৫৮. ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৮
৫৯. জর্দান ফাইন্যান্স হাউজ, আম্মান	১৯৮৮
কাজাকিস্তান	
৬০. আল-বারাকা কাজাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংক	-
৬১. ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক	-
কিবরিজ তুর্কী প্রজাতন্ত্র	
৬২. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিয়া লিঃ কে টি আর	১৯৮২
কুয়েত	
৬৩. কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ	১৯৭৭
লিচেন্সটাইন	
৬৪. আরিন্‌কো আরব ইনভেস্টমেন্ট কোং	-
৬৫. আই বি এস ফাইন্যান্স এস এ	-
লুক্সেমবার্গ	
৬৬. ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং	১৯৭৮
৬৭. ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানী	-
৬৮. ফয়সল হোল্ডিং এসএ	-
৬৯. ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ ইউনিভার্সাল হোল্ডিং	-
মালয়েশিয়া	
৭০. ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া বারহেড	১৯৮৩
৭১. তাবুং হাজী	১৯৬৩
৭২. শিরকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া	১৯৬৩
৭৩. আল-বারাকা ব্যাংক মালয়েশিয়া	১৯৯১
মৌরিতানিয়া	
৭৪. আল-বারাকা ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৩

www.pathagar.com

মরক্কো

৭৫. ব্যাংক আল-আজিদাহ, মরক্কো –

নাইজার

৭৬. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব নাইজার ১৯৮৩

৭৭. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী ১৯৮৪

৭৮. মাশরিক ফয়সল ইসলামিক –

পাকিস্তান

৭৯. ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট ১৯৭৯

৮০. ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব পাকিস্তান ১৯৭৯

৮১. হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন ১৯৭৯

৮২. স্মল বিজনেস ফাইন্যাস করপোরেশন ১৯৭৯

৮৩. ব্যাংকার্স ইকুইটি লিঃ ১৯৭৯

৮৪. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স করপোরেশন ১৯৭৯

৮৫. ইসলামিক মুদারাবা কোম্পানী ১৯৮০

৮৬. মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ১৯৮৫

৮৭. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৮৫

৮৮. ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৫

৮৯. হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৫

৯০. এলায়েড ব্যাংক অব পাকিস্তান লিঃ ১৯৮৫

ফিলিপাইন

৯১. ফিলিপাইনস আমানাহ ব্যাংক ১৯৭৩

৯২. আমানাহ ব্যাংক, লামবোঙ্গা ১৯৮২

ফিলিস্তিন

৯৩. প্যালেস্টাইনী ইসলামী ব্যাংক ১৯৯৬

কাতার

৯৪. কাতার ইসলামিক ব্যাংক, কাতার ১৯৮৩

৯৫. ইসলামিক এক্সচেঞ্জ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী ১৯৮০

www.pathagar.com

৯৬. কাতার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক	–
৯৭. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব দি গালফ (সারজাহ)	–
সৌদী আরব	
৯৮. ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	১৯৭৫
৯৯. আল–বারাকা ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোং	১৯৮২
১০০. আল–রাজী ব্যাংকিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন	১৯৮৪
সেনেগাল	
১০১. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৩
১০২. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
১০৩. মাশরিক ফয়সল আল–ইসলামী	–
দক্ষিণ আফ্রিকা	
১০৪. ফাস্ট মুসলিম ইন্টারেস্ট–ফ্রি বিজনেস ইন্সটিটিউশন	১৯৭৬
১০৫. ইসলামিক ব্যাংক, ডারবান	–
সুদান	
১০৬. আল–বারাকা ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮২
১০৭. ইসলামিক কো–অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	১৯৮৮
১০৮. ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান	১৯৭৭
১০৯. সুদানিজ ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৩
১১০. তাদামুন ইসলামিক ব্যাংক	–
১১১. ইসলামিক ব্যাংক ফর ওয়েস্টার্ন সুদান	১৯৮১
১১২. ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ	১৯৮০
১১৩. তাদামুন ইসলামিক কোম্পানী ফর ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট	–
১১৪. তাদামুন ইসলামিক কোম্পানী ফর সার্ভিসেস লিঃ	–
১১৫. তাদামুন ইসলামিক কোম্পানী ফর	–
এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট লিঃ	–

www.pathagar.com

১১৬. আল-বারাকা ব্যাংক অব সুদান	১৯৮৪
১১৭. আল-বারাকা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৪
১১৮. আল-শামাল ইসলামিক ব্যাংক	-
১১৯. ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী	-
১২০. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং	-

সুইজারল্যান্ড

১২১. দার আল-মাল আল-ইসলামী (ডি এম আই)	-
১২২. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ	-
১২৩. শরীয়া ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস এস এ	১৯৮০
১২৪. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট পুল (ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ড)	-
১২৫. তাকওয়া ব্যাংক	-
১২৬. সারজাহ ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস এস এ	১৯৮০
১২৭. খিরো ক্রেডিট ব্যাংক সুইজারল্যান্ড লিমিটেড	-

থাইল্যান্ড

১২৮. এরাবিয়ান-থাই ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী	-
১২৯. এরাবিয়ান-থাই ইনভেস্টমেন্ট কোং, ব্যাংকক	-

তিউনিশিয়া

১৩০. আল-সৌদী আল-তিউনিসি ফাইন্যান্সিং হাউজ	১৯৮৪
১৩১. বাইত ইত্তামুইন সৌদি-তিউনিশ	-

তুরস্ক

১৩২. আল-বারাকা তার্কিস ফাইন্যান্স হাউজ	১৯৮৪
১৩৩. ফয়সল ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন	১৯৮৪
১৩৪. কুয়েত তার্কিস আওকাফ ফাইন্যান্স হাউজ	-
১৩৫. ফয়সল ফরেন ট্রেড এন্ড মার্কেটিং কোং	-
১৩৬. ফয়সল রিয়েল এস্টেট কন্‌সট্রাকশন এন্ড ট্রেডিং কোং	-

www.pathagar.com

সংযুক্ত আরব আমিরাত

১৩৭.	দুবাই ইসলামিক ব্যাংক	১৯৭৫
১৩৮.	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং অব দি গালফ (সারজাহ)	১৯৭৮
১৩৯.	ইসলামিক আরব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮০

যুক্তরাজ্য

১৪০.	আ্যাল-রাজী কোম্পানী ফর ইসলামিক ইনভেস্টমেন্টস	১৯৮০
১৪১.	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব ইউকে	১৯৮২
১৪২.	ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউস পি এল সি (ইংল্যান্ড)	১৯৮১
১৪৩.	আল-বারাকা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১৯৮৩
১৪৪.	ফার্স্ট ইন্টারেস্ট ফ্রি ফাইন্যান্স কনসোর্টিয়াম	১৯৮২
১৪৫.	মাসেরাফ ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক	–
১৪৬.	আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	–
১৪৭.	উম্মাহ ফাইন্যান্স হাউস	–
১৪৮.	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ইউনিট	–
১৪৯.	ইউনাইটেড ব্যাংক অব কুয়েত পি এল সি, লন্ডন	–

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

১৫০.	ডি এম আই ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস	–
১৫১.	আল-বারাকা ব্যাংকোরপ, টেক্সাস	–
১৫২.	আল-বারাকা ব্যাংকোরপ, ক্যালিফোর্নিয়া	–
১৫৩.	মুসলিম সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট (এম এস আই)	–

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইসলামী ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এ সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। সংজ্ঞাটি হলো ঃ

"Islami Bank is a financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations."

"ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জন করে।"

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ করা হয়; এ আইনে ইসলামী ব্যাংকের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ঃ

"ইসলামী ব্যাংক এমন একটি কোম্পানী যা ইসলামী ব্যাংকিং কারবারে নিয়োজিত, আর ইসলামী ব্যাংকিং কারবার হলো এমন কারবার যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।"[১]

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা দু'টি বিশ্লেষণ করলে চারটি উপাদান পাওয়া যায় ঃ

১. সুদ বর্জন করা ঃ প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থা ঋণ ও সুদের উপর ভিত্তিশীল। এসব ব্যাংক ঋণ নিয়ে সুদ দেয় এবং ঋণ দিয়ে সুদ নেয়। গৃহীত সুদ ও প্রদত্ত সুদের পার্থক্যই হচ্ছে এদের মুনাফার প্রধান উৎস। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে সকল প্রকার সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম। ইসলামী ব্যাংক তাই ঋণের ব্যবসা করে না এবং সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ পরিহার করে চলে।

২. মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা ঃ সুদ বর্জন করার পর ইসলামী ব্যাংকের আয়ের বিকল্প পথ হচ্ছে বিনিয়োগ ও মুনাফা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের

www.pathagar.com

সূরা বাকারায় বলেছেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"[২] তাই ইসলামী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে ঋণ লেনদেন বর্জন করে এবং মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। এরূপে ব্যাংক বছরে যে মুনাফা অর্জন করে এর একটা অংশ অর্থ-জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করে এবং অপর অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ডিভিডেন্ড হিসেবে ভাগ করে দেয়।

৩. শরীয়ত নির্দেশিত হালাল কারবারে বিনিয়োগ করা ঃ ইসলামী শরীয়তে হারাম পণ্যের ব্যবসাকে হারাম করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে মদ কেবল পান করাই হারাম নয়, মদের উৎপাদন, মদের বিনিময় ও ব্যবসাও হারাম। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক শরীয়তে হারাম ঘোষিত সকল প্রকার ব্যবসা ও কারবার থেকে বিরত থাকে এবং শুধুমাত্র হালাল কারবারে বিনিয়োগ করে।

৪. হালাল পন্থা-পদ্ধতি অনুসরণ করা ঃ চতুর্থ এবং শেষ কথা হচ্ছে যে ইসলামী শরীয়তে হালাল কারবারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হারাম পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করাও হারাম। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ পন্থা-পদ্ধতিও বর্জন করে এবং কেবল হালাল পন্থাতেই ব্যবসা ও বিনিয়োগ করে থাকে।

মোটকথা, যে প্রতিষ্ঠান সুদ, হারাম কারবার এবং হারাম পদ্ধতি পরিহার করে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে হালাল পথে যাবতীয় ব্যাংকিং কাজ পরিচালনা করে, তাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি

বিশ্বে প্রচলিত প্রতিটি সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কোন না কোন বিশ্বাস বা দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। উদাহরণস্বরূপ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুবাদ, অবাধ ব্যক্তি-মালিকানা এবং নিরংকুশ ব্যক্তি-স্বাধীনতাই (Laissez-Faire) অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠি।এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদের মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অপরদিকে ব্যক্তি-মালিকানাই যাবতীয় জুলুম, শোষণ ও বৈষম্যের মূল; তাই ব্যক্তি-মালিকানার উচ্ছেদ এবং সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নতি ও মুক্তি নিহিত।এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। একইভাবে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরবের পৌত্তলিক ও গোষ্ঠীবাদী সমাজ যখন বিশ্বাস করলো যে এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মালিক ও বিধানদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সাঃ) মাধ্যমে প্রাপ্ত কুরআন এবং সুন্নাহই হচ্ছে মানুষের উন্নতি, শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ, তখন এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলো ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এ দর্শন থেকেই উৎসারিত। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সেই একই দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার উপর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ভিত্তিশীল। বস্তুতঃ ইসলামে মানব জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রভৃতি দিক ও বিভাগের একটিকে অপরাপর দিক ও বিভাগ থেকে পৃথক করে দেখা হয় না, বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে একই সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ এবং পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনীতি এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক দার্শনিক ভিত্তিগুলো হচ্ছে ঃ তৌহিদ ও রবুবিয়াত, খিলাফত ও রিসালাত এবং আখিরাত।

১. তৌহিদ ও রবুবিয়াত

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার ভিত্তি বা মৌলিক বিশ্বাসের প্রথম কথা হলো তৌহিদ ও রবুবিয়াত। তৌহিদ ও রবুবিয়াতের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহ এক, একক ও অদ্বিতীয়;[৩] তিনিই সৃষ্টিকুলের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক, প্রভু ও প্রতিপালক;[৪] সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই।[৫] অর্থনীতি ক্ষেত্রে তৌহিদ ও রবুবিয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ বিশ্বের সকল মানুষ, মানুষের যোগ্যতা-প্রতিভা ও শক্তি-ক্ষমতা এবং এ মহাবিশ্ব ও এর যাবতীয় সম্পদরাজির একমাত্র স্রষ্টা, মালিক, প্রভু ও সার্বভৌম নিয়ন্তা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। বস্তুতঃ তৌহিদ ও রবুবিয়াতের দ্বারাই আল্লাহর সাথে মানুষের, মানুষের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে অন্যান্য সৃষ্টিকুলের সম্পর্ক নির্ধারিত ও নিরূপিত হয়।[৬] তৌহিদ দর্শনের মূলকথা হচ্ছে ঃ মানুষের স্রষ্টা ও প্রভু হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, আর মানুষ হচ্ছে আল্লাহরই সৃষ্ট বান্দাহ ও দাস;[৭] আল্লাহ হচ্ছেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র বিধানদাতা;[৮] আর আল্লাহর সৃষ্ট বান্দাহ হিসেবে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে একমাত্র তাঁরই বিধান মেনে চলা। সুতরাং আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির, প্রভু ও দাসের, বাদশাহ ও প্রজার এবং আইনদাতা ও আনুগত্যকারীর।

রবুবিয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র প্রতিপালনকারী। প্রকৃতপক্ষে মানুষসহ সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তথা জীবিকার ঐশী ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে রবুবিয়াতের মর্মকথা।[৯] আল্লাহ এ বিশ্বজাহানে অসংখ্য-অগণিত সম্পদরাজির এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে সকল যুগের সকল মানুষ তাদের যোগ্যতা-প্রতিভা নিয়োজিত করে এ থেকে প্রয়োজনীয় জীবন-সামগ্রী আহরণ, উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ করতে পারে এবং পৃথিবীতে সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারে।

দুনিয়ার সকল মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার সন্তান। সুতরাং সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই।[১০] এ সম্পর্ক পারস্পরিক সহমর্মিতা ও

www.pathagar.com

সহযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। গোটা বিশ্ব-প্রকৃতি আল্লাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন; তাই আল্লাহর সাথে সকল মানুষের সম্পর্ক যেমন একই রকম, তেমনি বিশ্বের সম্পদের উপর সকল মানুষের অধিকার ও দায়িত্বও একইভাবে স্বীকৃত।[১১] আল্লাহর বিধান দ্বারাই এ সম্পর্ক, অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত ও নিরূপিত হতে হবে। তৌহিদ হচ্ছে এমন একটি মুদ্রা যার দু'টো পিঠ রয়েছে; এক পিঠে বলা হয়েছে যে আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা এবং অপরদিকে বলা হয়েছে যে মানুষ হচ্ছে সমান অংশীদার, অথবা প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষের ভাই।[১২]

২. খিলাফত ও রিসালাত

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি বা বিশ্বাস হচ্ছে খিলাফত ও রিসালাত। খিলাফত হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব; ইংরেজীতে বলা যায় Vicegerency বা Trusteeship. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা, Viceroy বা Trustee হিসেবে। কুরআন মজীদের সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন, "এবং স্মরণ কর সেই সময়ের কথা,যখন তোমাদের রব ফিরিশতাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করব।"[১৩]

রিসালাত হচ্ছে খলিফাদের মধ্য থেকে রাসূল মনোনয়ন করে তাঁর মাধমে খলিফাদের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ও বিধান পাঠানোর খোদায়ী ব্যবস্থা।[১৪] বস্তুতঃ পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি নিয়োগ করার পর প্রতিনিধির দায়িত্ব হচ্ছে মালিকের ইচ্ছা তথা আইন-বিধান অনুসারে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা। এজন্য প্রকৃত মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আইন-কানুন পাওয়া জরুরী। আল্লাহ তায়ালা রিসালাতের মাধ্যমে তাঁর আইন-কানুন তাঁর প্রতিনিধি মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন।

ইতিপূর্বে তৌহিদ ও রবুবিয়াত সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে যে এ বিশ্বজাহান, এর সম্পদরাজি, এমনকি মানুষের নিজ সত্তা, তার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা-প্রতিভা এ সবকিছুর প্রকৃত ও একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এরপর খিলাফত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মানুষ হচ্ছে সেই প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি। আর রিসালাতের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে প্রতিনিধির অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত মালিকের বিধি-বিধান পাওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে রিসালাত।

আল্লাহ পৃথিবীতে নিজের খলিফা বানিয়ে মানুষকে একদিকে যেমন সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের (সাঃ) মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারে ট্রাস্ট সম্পদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিরাট দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ তাঁর নিজ পরিকল্পনায় মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য সামনে রেখে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং একে মানুষের বসবাসের উপযোগী বানিয়ে এখানে বেঁচে থাকা ও বসবাস করার জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় যাবতীয় সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। এরপর সম্পদ আহরণ, উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ-ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা-প্রতিভা ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে মানুষকে তাঁর খলিফা করে পাঠিয়েছেন। অতঃপর খলিফাদের মধ্য থেকে যুগে যুগে রাসূল নির্বাচন করে তাঁদের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ, উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ-ব্যবহার সংক্রান্ত আল্লাহর আইন-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতি মানুষকে জানিয়ে ও শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর দেয়া যোগ্যতা-প্রতিভাকে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁরই আইন-বিধান ও নিয়ম অনুসারে কাজে লাগানো। আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদরাজি হতে তাঁরই শেখানো নিয়ম অনুসারে সম্পদ আহরণ করা, তাঁরই আইন অনুসারে সম্পদ বিনিয়োগ ও উৎপাদন করা, তাঁরই দেয়া বিধান অনুসারে সম্পদ বন্টন ও বিনিময় করা এবং তাঁরই কানুন মোতাবেক সম্পদের ভোগ ও ব্যবহার করা। আল্লাহর নিযুক্ত ট্রাস্টি হিসেবে এর অন্যথা করার অধিকার মানুষের নেই। আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষ যদি নিজের ইচ্ছা অথবা অন্য কারো রচিত আইন অনুযায়ী এ কাজ করে, তাহলে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে; সে ক্ষেত্রে মানুষ আমানতের খেয়ানতকারী ও মালিকের বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে এবং খলিফার মর্যাদা থেকে মানুষ হবে অপসারিত।

৩. আখিরাত

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তৃতীয় ও শেষ মৌলিক ভিত্তি বা বিশ্বাস হচ্ছে আখিরাত বা পরকাল অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। আখিরাতের মূলকথা হচ্ছে, এ পৃথিবীর জীবনই মানুষের শেষ নয়; বরং মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ আরেক জগতে প্রবেশ করবে এবং চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে। এ পৃথিবীর বর্তমান ব্যবস্থা একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং আর একটি নতুন জগত সৃষ্টি করা হবে। সেখানে সকল মানুষকে আবার জীবিত করা হবে। আল্লাহর আদালত কায়েম করা হবে এবং পৃথিবীর জীবনে মানুষ তার উপর অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে কিনা সেখানে তার হিসাব নেয়া হবে। আল্লাহর বিচারে যারা সফল প্রমাণিত হবেন, তাঁদের বেহেস্তের নেয়ামত দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে; যারা ব্যর্থ প্রমাণিত হবে, তাদের দোজখের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

আল্লাহর প্রভুত্ব ও মালিকানা এবং মানুষের খিলাফতের পর আখিরাত বা পরকালীন জীবন, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। পরকালীন জীবনে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কার লাভের আশা প্রতি মুহূর্তে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর আইন-বিধান অনুসারে সম্পদের আহরণ, বিনিয়োগ, উৎপাদন, বন্টন-বিনিময় ও ভোগ-ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করে এবং সতর্ক রাখে। মূল মালিকের কাছে জবাবদিহি করার

www.pathagar.com

তীব্র অনুভূতি মানুষকে সর্বদা দায়িত্ব সচেতন রাখে এবং কোথাও কোন ত্রুটি হয়ে না যায় সেজন্য সদা সচেতন থাকতে বাধ্য করে। আর কখনো ভুল হয়ে গেলে মানুষ তার মালিকের কাছে লজ্জিত হয় এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার এ অনুভূতি মানুষকে যাবতীয় অন্যায়, জুলুম, শোষণ তথা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্‌র বিধানের অনুগত বানিয়ে দেয়।

ইসলামী ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই আল্লাহর খলিফা হিসেবে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধান অনুসারে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সম্পদ সমাবেশ ও বিনিয়োগ করে, যাতে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সধিত হয় এবং পরকালে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ করা যায়।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য দিক ও বিভাগের মতো এর অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকেও ইসলামের প্রধান আর্থ–সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে হয়। নীচে ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো ঃ

১. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম করা

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম এবং এ ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল হারাম পথ, পন্থা ও পদ্ধতি থেকে মানবতাকে মুক্ত করাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়–উপকরণের ব্যবহার এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান এবং সমাজের উন্নয়ন সাধিত হবে।

এছাড়া ডঃ এম. ওমর চাপরা ইসলামী ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করেছেন।[১৫]

২. অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জন করা

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলিফা। খলিফা হিসেবে মানুষ যাতে যথার্থ মর্যাদার সাথে পৃথিবীতে জীবন–যাপন করতে পারে, সেজন্য ইসলামী শিক্ষা সম্বলিত হেদায়াতনামা দেয়া হয়েছে। এ হেদায়াতের লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনকে সমৃদ্ধশালী ও মর্যাদাশীল করে গড়ে তোলা; দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এবং ক্লেশপূর্ণ জীবন ইসলামের কাম্য নয়।

মুসলিম আইনবেত্তাদের মতে, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন এবং তাদের যাবতীয় দুঃখ–কষ্টের অবসান করাই হচ্ছে শরীয়তের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে যাবতীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মানুষের সকল দুঃখ–কষ্টের অপসারণ এবং মানব–জীবনের গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন

www.pathagar.com

করা। বস্তুতঃ এ উদ্দেশ্যে গৃহীত যে কোন কর্ম-প্রচেষ্টাকে ইসলাম পুণ্যের কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে, যে কারণে মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইসলামী ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উদ্দেশ্য। বস্তুগত সম্পদের পূর্ণ ও দক্ষ ব্যবহারও অবশ্যই প্রয়োজনীয়। ইসলামের মতে, 'আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ মানব-কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে সম্পদের যথার্থ ও পরিমিত ব্যবহার অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জনের জন্য এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের পূর্ণ ও দক্ষ ব্যবহার এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা যায় এবং এর স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জন করা সম্ভব হয়।

৩. আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা

ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্য ইসলামের নৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পুঁজিবাদের গোটা ব্যবস্থা, বিশেষ করে এর অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা এ লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত নয়। ফলে এ ব্যবস্থায় সৃষ্ট আয় ও সম্পদের পর্বত-পরিমাণ বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইসলাম প্রথমে বৈষম্য সৃষ্টির কারণগুলোর মূলোৎপাটন করেছে; অতঃপর বৈষম্য আরো হ্রাস করার জন্য যাকাত, করারোপ এবং সম্পদ হস্তান্তরের মত অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুতরাং অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনভাবে রূপায়ণ করতে হবে, যাতে তা অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এবং সম্পদ ও আয় বন্টনে অবদান রাখতে পারে।

৪. মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন করা

মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে ইসলামী অর্থব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ মুদ্রামানের অস্থিরতা কখনো মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়, আবার কখনো দীর্ঘমেয়াদী মন্দা ও বেকারত্ব সৃষ্টি করে। উভয় অবস্থাই ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতি ক্রমান্বয়ে আর্থিক সম্পদের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়ে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং ভোক্তা জনসাধারণের উপরজুলুম চাপিয়ে দেয়। মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনশীল কর্ম-প্রচেষ্টার পরিবর্তে ফটকা কারবারকেউৎসাহিত করে এবং আয়-বৈষম্যকে তীব্রতর করে তোলে। এভাবে নৈতিক মূল্যবোধকেও বিকৃত করে দেয়। সুতরাং ইসলামী মূল্যবোধ ও মুদ্রাস্ফীতি পরস্পর বিরোধী।

অপরপক্ষে দীর্ঘস্থায়ী মন্দা ও বেকারত্বকেও ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ মন্দা ও বেকারত্ব অধিকাংশ জনগণের দুর্দশা বাড়িয়ে দেয় এবং সামাজিক কল্যাণকে ব্যাহত করে। মন্দা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।

www.pathagar.com

সুতরাং ইসলামের সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার মূলোৎপাটন করে অর্থনৈতিক অস্থিরতার নিরসন এবং মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. রিবা বা সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি

সুদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলাই ইসলামী ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতিতে ব্যাংক আর যাই হোক, ইসলামী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ ইসলাম সুদকে হারাম করেছে। ইসলামের এ নিষেধাজ্ঞাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তি। জীবন সম্পর্কে ইসলাম যে ধ্যান-ধারণা পেশ করেছে, তার সাথে ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ সংগতিশীল। ইসলামী সমাজে এ জাতীয় যত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, তাও একই ভিত্তির ওপর স্থাপিত হবে। ফলে ইসলামী সমাজের অবকাঠামোর সাথে ইসলামী ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্যের কোন বিরোধ থাকবে না।

২. বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রম ও উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা। প্রচলিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ লগ্নি করে; এ লগ্নি বা ঋণের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে সুদ। পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার দার্শনিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে এটাই স্বাভাবিক। যে ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কার্যক্রম সেই ধ্যান-ধারণার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক। পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণায় হারাম-হালালের প্রশ্ন অবান্তর। সমাজের সাধারণ স্বার্থ ও কল্যাণ সেখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। ব্যক্তিকে সেখানে অবাধ ও নিরংকুশ স্বাধীনতা দেয়া হয়। ফলে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ ও হাসিলের জন্য ব্যক্তি তার সকল শক্তি ও কর্ম-প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে থাকে।

পুঁজিবাদী ব্যাংক যে সব প্রকল্পে অর্থ লগ্নি করে, সে সব প্রকল্পের কাজের ধরন, সমাজের ওপর এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোন বিচার-বিবেচনা করে না। সকল ক্ষেত্রে ব্যাংক কেবল একটি বিষয়ই বিবেচনা করে, তা হলো সুদ বা আয় পাওয়ার নিশ্চয়তা। অর্থাৎ যতক্ষণ কোন প্রকল্পে মুনাফা হতে থাকে আর ব্যাংক তার প্রাপ্য সুদ যথারীতি পেতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক উক্ত প্রকল্পে অর্থলগ্নি করতে দ্বিধা করে না। সুদ ভিত্তিক ঋণের অর্থ তাই মানবতার জন্যে কল্যাণকর প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয় না। মুনাফার প্রতি খেয়াল রেখে সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্পে এ অর্থ খাটানো হয়। এতে সমাজের ক্ষতি হলে বা এর নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে গেলেও তাতে বিনিয়োগকারীর কিছু আসে-যায় না। একমাত্র মুনাফার প্রতিই তার লক্ষ্য থাকে।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকের ধ্যান-ধারণা সুদী ব্যাংকের ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম এবং ইসলামের নিজস্ব জীবন-দর্শনই হচ্ছে এ ব্যাংকের বুনিয়াদ। এ ব্যবস্থায় সুদী লেনদেনের কোনই অবকাশ নেই। ইসলামী আইনবেত্তাগণ ইসলামী ব্যাংকের জন্যে সুদের বিকল্প হিসেবে দু'টি পন্থা অনুমোদন করেছেন। সুদ পরিহার করে ইসলামী ব্যাংক এ দু'উপায়েই অর্থ লেনদেন করছে ঃ

(ক) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ঃ এ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক নিজেই কোন প্রকল্পে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করবে। প্রকল্পে অর্জিত সাকুল্য মুনাফা ব্যাংকেরই থাকবে। আর এতে লোকসান হলে তার পুরোটাই ব্যাংক নিজে বহন করবে।

(খ) অংশীদারী বিনিয়োগ ঃ এ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক কোন উৎপাদনমুখী প্রকল্পের মূলধনে অংশ গ্রহণ করবে এবং প্রকল্পের মালিকানায় অংশীদার হবে। এ ক্ষেত্রে সহ-অংশীদার হিসেবে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানেও ব্যাংকের প্রত্যক্ষ অংশ থাকবে এবং পূর্ব-নির্ধারিত চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হবে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অতি স্পষ্ট। এখানে সুদ-রূপী পূর্ব-নির্ধারিত সুনিশ্চিত আয়ের মাধ্যমে শোষণের কোন অবকাশ নেই। সুদী ব্যবস্থায় মূলধন পূর্ণ নিরাপদ, উপরন্তু সুদের মাধ্যমে আসলের বৃদ্ধিও সুনিশ্চিত। ফলে সুদী ব্যাংক প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির দিকে আদৌ কোন নজর দেয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় অংশীদারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক মুনাফায় ও লোকসানে অংশগ্রহণ করার স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শর্তে কারবারে অর্থ যোগান দেয়। সুতরাং এতে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট আয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই; উপরন্তু লোকসানের ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব রয়েছে।

ইসলামী ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী জীবন-দর্শনের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত। তাই শরীয়তের আলোকে বৈধ এবং সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হলেই কেবল ব্যাংক কোন প্রকল্পে সরাসরি বা অংশীদারী ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং কোন প্রকল্পে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা অংশ গ্রহণের পূর্বে ইসলামী ব্যাংককে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় ঃ

(ক) সরাসরি বিনিয়োগের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ও সেবা মানুষের বৈধ প্রয়োজন পূরণ করবে কিনা ;

(খ) উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ও সেবা হালাল সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত কিনা ;

(গ) উৎপাদন-প্রক্রিয়ার স্তরসমূহ (অর্থ সংগ্রহ, শিল্পায়ন, ক্রয়, বিক্রয়) হালাল কিনা;

(ঘ) উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ, কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতি, মজুরী ব্যবস্থা ইত্যাদি বৈধ নির্দেশের সাথে সংগতিশীল কিনা; এবং

www.pathagar.com

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভ দেখার সাথে সাথে সমাজের সাধারণ কল্যাণ এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি যথাযথ নজর রাখা হয়েছে কিনা।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন

ইসলামী ব্যাংকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ইসলামের মৌলিক আক্বিদা–বিশ্বাস এবং মানব জীবন সম্পর্কে এর নিজস্ব ধারণা থেকেই ইসলামী ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্য উৎসারিত হয়েছে। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর এক অংশকে অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা অসম্ভব।

সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ইসলামের নীতি। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ যাকাতের কথা বলা যেতে পারে। যাকাত আদায় ও বন্টন করা একটি সামাজিক ও ধর্মীয় কাজ। কিন্তু ইসলাম একে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতির মধ্যে শামিল করে দিয়েছে, যার ফলে যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজটি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম রাজনৈতিক দায়িত্বেও পরিণত হয়েছে। এ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। ইসলামী ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাইলে তা ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিপূর্ণ হবে না। কারণ পৃথকভাবে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি নজর দিতে গেলে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে ব্যক্তিস্বার্থের ফাঁদে পড়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপৃত হয়ে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। অর্থনৈতিক উদ্যোগের সামাজিক ও নৈতিক লাভালাভ ও গুরুত্ব যাচাই না করে কেবল ব্যক্তিগত লাভ হিসেব করলে সামাজিক ও নৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে বাধ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উদ্যোগের সামাজিক লাভই হচ্ছে ঈমান ও মূল্যবোধের সাথে অর্থনৈতিক সংগঠনের সম্পর্ক নিরূপণের প্রধান উপাদান বা মাপকাঠি।

সামাজিক লাভালাভের ব্যাপারে সুদী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ঐতিহ্যগতভাবেই সুদী ব্যাংকের কাজ কেবলমাত্র এর ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক যেমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তেমনি একটি সামাজিক ও নৈতিক প্রতিষ্ঠানও। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক শুধু নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে না, বরং নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি মনে করে। নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে কোন সুফলই দিতে পারে না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই কাজ করে এবং সামাজিক স্বার্থ ও ন্যায়বিচারের নীতির সাথে সংগতি রক্ষা করে চলে। ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকের ন্যায় সামাজিক উন্নয়ন বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত লাভালাভের দৃষ্টিতেই সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে না।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

সুদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী

সুদের সংজ্ঞা

সুদের জন্য কুরআন মজীদে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হচ্ছে 'রিবা'। সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর রিবাকে করেছেন হারাম।"[১] আরবী 'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু উপরের আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সকল প্রকার বৃদ্ধিকে রিবা বলা হয়নি এবং হারামও করা হয়নি। বরং আল্লাহ ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজির যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে সম্পূর্ণ হালাল করেছেন। বস্তুতঃ কুরআন মজীদে এক বিশেষ অর্থে 'রিবা' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

ইসলামে সেই বৃদ্ধিকে 'রিবা' বলা হয়েছে যা প্রদত্ত ঋণের উপর শর্ত হিসেবে আদায় করা হয়। জাহিলিয়াতের যুগে আরব দেশে অর্থ ধার দেওয়া হলে ঋণদাতা ঋণ-গ্রহীতার কাছ থেকে আসলের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতো। অনেকে দ্রব্য-সামগ্রী ও শস্য ধার দিতো এবং শর্ত অনুসারে অতিরিক্ত পণ্য ও শস্য ফেরত নিত। তদানীন্তন আরবে ঋণের আসলের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত অর্থ এবং দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হতো 'রিবা'। আল-কুরআনে 'রিবা' শব্দের ব্যবহার তৎকালে সাধারণভাবে প্রচলিত এই অর্থেই করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের সূরা আলে-ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, "হে মুমীনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেছেন, এখানে আল্লাহ মুমীনদের সেই 'রিবা' খেতে নিষেধ করেছেন যা তারা ইসলাম-পূর্বকালে খেতো।[২]

নবী করিম (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণেও 'রিবা'র-এই অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "ইসলাম-পূর্ব যুগের সকল 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে; তবে তোমরা তোমাদের আসল ফেরত নিতে পার, যাতে তোমরা অত্যাচার না কর এবং অত্যাচারিত না হও।"[৩] রাসূল (সাঃ) তাঁর এক হাদীসেও 'রিবাকে' প্রতীক্ষাজনিত বৃদ্ধি বলে উল্লেখ করেছেন। উসামাহ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "প্রতীক্ষাতেই 'রিবা' রয়েছে . . .।"[৪]

ইমাম ফখর আর-রাযী উল্লেখ করেছেন যে জাহিলিয়াতের যুগে 'রিবা' সকলেরই জানা ছিল এবং আরবদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। সে যুগে তারা ঋণ দিতো এবং শর্ত অনুসারে তার উপর মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় করতো; কিন্তু আসলের পরিমাণ

www.pathagar.com

অপরিবর্তিত থাকতো। পরিশোধের সময় হলে মূলধন ফেরত চাওয়া হতো, ঋণ-গ্রহীতা ফেরত দিতে না পারলে ঋণদাতা পরিশোধ্য ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিতো।[৫]

আবু বকর আল-জাসাস লিখেছেন, "জাহিলী যুগে ঋণদাতা ও ঋণ-গ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হতো; তাতে বলা হতো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ-গ্রহীতা দাতাকে নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্তসহ আসল ফেরত দিবে।"[৬]

ইবনে হাজার আস-কালানী বলেন, " পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হচ্ছে 'রিবা'; যেমন-এক দীনারের বিনিময়ে দুই দীনার।"[৭]

তদানীন্তন আরবে প্রচলিত এ ধরনের লেনদেনকে আরববাসীরা নিজেদের ভাষায় 'রিবা' নাম দিয়েছিল; কুরআন মজীদ এই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করেছে।[৮]

এ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে ধারকৃত পণ্য বা মূলধনের উপর শর্ত অনুসারে অতিরিক্ত দেয়াই হচ্ছে 'রিবা' বা সুদ।

সুদের বৈশিষ্ট্য

উপরে আলোচিত সুদের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে সুদের চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

(১) সুদের উদ্ভব হয় ঋণের ক্ষেত্রে; ঋণ নগদ অর্থে হোক অথবা পণ্য-সামগ্রীর আকারে হোক;

(২) ঋণের শর্ত হিসেবে আসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া;

(৩) সময়ের অনুপাতে বৃদ্ধির পরিমাণ বা সীমা নির্ধারিত হওয়া; এবং

(৪) উপরের তিনটি বিষয়কে লেনদেনের শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা।

ঋণ সংক্রান্ত যে কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে এ চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে তা নিঃসন্দেহে সুদী লেনদেনে পরিণত হবে। এক্ষেত্রে ঋণের উদ্দেশ্য এবং ঋণ-গ্রহীতা ধনী বা দরিদ্র যাই হোক, তাতে সুদের আসল চরিত্রে কোন পার্থক্য হবে না।

সুদের শ্রেণী বিন্যাস

ইসলামী শরীয়তে দুই প্রকার রিবার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে 'রিবা নাসিয়া' এবং 'রিবা ফদল'।

১. রিবা নাসিয়া

কুরআন মজীদে উল্লেখিত 'রিবা'ই হচ্ছে রিবা নাসিয়া। কেবল ঋণের ক্ষেত্রেই রিবা নাসিয়ার উদ্ভব ঘটে। সে ঋণ নগদ অর্থে হোক, অথবা পণ্য আকারে হোক, তার উপর ধার্যকৃত রিবা হচ্ছে রিবা নাসিয়া। আর ঋণ যেহেতু কোন না কোন সময়ের জন্যই হয়ে

www.pathagar.com

থাকে, সেজন্য রিবা নাসিয়া হচ্ছে সময়ের বিনিময়। নাসিয়া শব্দের মূল হচ্ছে 'নাসায়া'; 'নাসায়া'–র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্থগিত, বিলম্বিত বা প্রতীক্ষা।[৯] পারিভাষিক অর্থে ঋণে সেই মেয়াদকালকে নাসায়া বলা হয় যা ঋণদাতা আসল ঋণের উপর নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণ–গ্রহীতাকে নির্ধারণ করে দেয়।[১০] সুতরাং রিবা নাসিয়া হচ্ছে ঋণের উপর সময়ের প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশ। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ঋণদাতা 'ক' ঋণগ্রহীতা 'খ'কে এই শর্তে ১০০.০০ টাকা এক বছরের জন্য ঋণ দিলো যে এক বছর পর 'খ' উক্ত ১০০.০০টাকা আসলের সাথে অতিরিক্ত আরো ১০.০০ টাকা ফেরত দেবে। এক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত দশ টাকা ১০০.০০ টাকার ১ বছরের বিনিময় বা রিবা নাসিয়া। অনুরূপভাবে পণ্য–ঋণের ক্ষেত্রে যদি ঋণদাতা ঋণ–গ্রহীতাকে এক কেজি লবণ এ শর্তে ধার দেয় যে এক মাস পর গ্রহীতা ১.৫০ কেজি লবণ ফেরত দেবে,তাহলে অতিরিক্ত ০.৫০ কেজি লবণ হবে এক কেজি লবণ এক মাস রাখার বিনিময়। আর এটাই 'রিবা নাসিয়া'। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর হাদীস থেকেও রিবা নাসিয়ার ঐ অর্থ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "নাসিয়া" ব্যতীত রিবা নেই এবং "প্রতীক্ষাতেই রিবা রয়েছে।"[১১]

২. রিবা ফদল

ইতিপূর্বে রিবা নাসিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদকে বলা হয় রিবা নাসিয়া। কিন্তু রিবা ফদলের উদ্ভব হয় হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশী পরিমাণ হাতে হাতে বিনিময় করা হলে দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় 'রিবা ফদল'। উদাহরণস্বরূপ, এক কিলোগ্রাম উন্নতমানের খেজুরের সাথে দুই কিলোগ্রাম নিম্নমানের খেজুর হাতে হাতে বিক্রয় বা বিনিময় করা হলে নিম্নমানের খেজুরের ঐ অতিরিক্ত এক কিলোগ্রামই হবে 'রিবা ফদল'। অথবা এক টাকার দুইটি খারাপ মুদ্রা যদি এক টাকা মূল্যের ভাল মুদ্রার সাথে বিনিময় করা হয়, তাহলে খারাপ মুদ্রার অতিরিক্ত অংশ হবে 'রিবা ফদল'। জাহিলী যুগে আরবদেশে এ ধরনের বিনিময় প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল। কিন্তু আরববাসীরা এরূপ বিনিময়কে রিবা বলে জানতো না এবং একে রিবা বলতো না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একে রিবা বলে ঘোষণা করেন এবং এ ধরনের বিনিময় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)–এর স্পষ্ট হাদীস রয়েছে, " আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, সোনার সাথে সোনা, রূপার সাথে রূপা, গমের সাথে গম,যবের সাথে যব, খেজুরের সাথে খেজুর এবং লবণের সাথে লবণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে হাতে হাতে বিনিময় (Spot Exchange) করা উচিত। এরূপ বিনিময়ে যে বেশী বা কম দেয় বা নেয়, সে–ই সুদী কারবার করে। এক্ষেত্রে দাতা ওগ্রহীতা উভয়েই সমান।"[১২] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) আরো বর্ণনা করেছেন যে, " একদা বিলাল (রাঃ) রাসূলে করীমের (সাঃ) নিকট কিছু

www.pathagar.com

উন্নত মানের খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা' থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল (রাঃ) উত্তরে বললেন, আমাদের খেজুর খারাপ ছিল, তাই আমি দ্বিগুণ পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে একগুণ ভাল খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, আহ! এটাতো সুদের মতোই হলো, এতো সুদের মতোই; কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, তাহলে প্রথমে তোমার খেজুর বাজারে অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে, তারপর সে দ্রব্যের সাহায্যে ভালো খেজুর কিনে নেবে।"[১৩]

উপরে বর্ণিত 'রিবা নাসিয়ায়' সুদের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এর কোন ব্যাখ্যা দরকার হয় না। এককথায়, ঋণ সময়ের প্রেক্ষিতে যে অর্থ বা পণ্য জন্ম দেয় তাই হচ্ছে 'রিবা নাসিয়া'। অপরদিকে কোন দ্রব্য হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত পরিমাণের সমজাতীয় দ্রব্যের জন্ম দেয়, তবে তা রিবা ফদলের পর্যায়ভুক্ত হয়, বরং এ অতিরিক্ত জন্ম দেওয়াটাই রিবা ফদল। তাই রাসূলে করীম (সাঃ) নিজের পণ্য বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা পছন্দমত উক্ত দ্রব্য ক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

মুনাফার সংজ্ঞা

আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম এবং মুনাফাকে হালাল করেছেন। তাই সুদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর মুনাফার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং সুদ ও মুনাফার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরী।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মোট আয় হতে মোট উৎপাদন খরচ অর্থাৎ জমির খাজনা, শ্রমের মজুরী ও পুঁজির সুদ বাদ দেওয়ার পর ব্যবস্থাপনার হাতে যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাকে বলা হয়েছে মুনাফা। উদ্বৃত্ত বেশী থাকলে মুনাফা বেশী হয়, উদ্বৃত্ত কম থাকলে মুনাফা কম হয়; আর উদ্বৃত্ত যদি না থাকে তাহলে মুনাফা হয় না বা লোকসান হয়। সুতরাং মুনাফার পূর্ব-নির্ধারিত কোন হার নাই।

অন্যকথায়, মুনাফা হচ্ছে বিনিয়োজিত পুঁজির বর্ধিত অংশ, আর লোকসান হচ্ছে পুঁজির ক্ষয়প্রাপ্ত বা খোয়া যাওয়া অংশ। অর্থাৎ কোন উদ্যোক্তা কোন ব্যবসায় এক লাখ টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করে এক বছর পর যাবতীয় খরচ বাদে যদি ১,২০,০০০/-টাকা পায়, তাহলে পুঁজির বর্ধিত অংশ অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা হবে তার মুনাফা। অপরদিকে এক বছর পর সব খরচ বাদে যদি সে দেখে যে তার হাতে মাত্র নব্বই হাজার টাকা আছে, তাহলে পুঁজির হ্রাসপ্রাপ্ত বা খোয়া যাওয়া দশ হাজার টাকা হবে তার লোকসান।

এ হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মুনাফার সংজ্ঞা। কিন্তু মুনাফার উক্ত পুঁজিবাদী সংজ্ঞার সাথে ইসলামী অর্থনীতির মুনাফার সংজ্ঞার পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ। ইসলামী অর্থনীতিতে তাই সুদ লেনদেনের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতিতে মোট আয়

www.pathagar.com

হতে মোট উৎপাদন খরচ হিসেবে কেবল জমির খাজনা ও শ্রমের মজুরী বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই বলা হয় মুনাফা। অর্থাৎ কোন পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে খাজনা ও মজুরী বাবদ মোট খরচ বাদ দেয়ার পর যদি বিনিয়োজিত পুঁজি বৃদ্ধি পায়, তাহলে পুঁজির সেই বর্ধিত অংশকে বলা হয় মুনাফা। আর যদি পুঁজি হ্রাস পায়, তাহলে এর হ্রাসপ্রাপ্ত অংশ হয় লোকসান।

ইসলামী আইনে বলা হয়েছে যে মুনাফা হচ্ছে সম্পদের এমন প্রবৃদ্ধি যা কোন অর্থনৈতিক কারবারে সম্পদ বিনিয়োগ করার ফলে অর্জিত হয়। উদ্যোক্তা প্রথমে বিনিয়োজিত অর্থকে পণ্যে রূপান্তরিত করে, অতঃপর উক্ত পণ্য বিক্রি করে পণ্যকে অর্থে রূপান্তরিত করে। এভাবে রূপান্তরিত অর্থ বিনিয়োজিত অর্থের তুলনায় বেশী হলে উদ্যোক্তা লাভ পায়; কিন্তু যদি প্রাপ্ত অর্থ পূর্বের তুলনায় কম হয়, তাহলে তার পুঁজি কমে যায় বা তার লোকসান হয়।[১৪] মুনাফা তাই পুঁজিকে রূপান্তরিত করে ঝুঁকি গ্রহণের ফল।

এ আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে পুঁজি খাটানোর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মানবীয় শ্রম নিয়োগ ও ঝুঁকি গ্রহণের ফলস্বরূপ মুনাফা অর্জিত হয়। কারণ পুঁজি কখনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায় না; পুঁজি যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্যোক্তার শ্রমের সাথে মিলিত না হয়, ততক্ষণ ১০০ টাকা ১০০ টাকাই থাকে; কিন্তু ১০০ টাকা যখন কোন দক্ষ উদ্যোক্তা বিনিয়োগ করে একে পণ্যে রূপান্তরিত করে, তারপর আবার সে পণ্যকে টাকায় ফিরিয়ে আনে এবং এভাবে ঝুঁকি গ্রহণ করে, তখনই কেবল ১০০ টাকা বর্ধিত হতে পারে, এমনকি বহুগুণেও বর্ধিত হতে পারে। তাই বিনিয়োগ ব্যতীত পুঁজির প্রবৃদ্ধি হয় না; অন্যকথায় পুঁজি নিজে সম্পদের জন্ম দিতে পারে না। সুতরাং মুনাফা হচ্ছে মানবীয় শ্রমের সাহায্যে পুঁজি খাঁটিয়ে ঝুঁকি গ্রহণ করার ফল।

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

উপরে আলোচিত সুদ ও মুনাফার সংজ্ঞা থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুনাফা মূলতঃ দ্রব্য–সামগ্রী ও সেবার ক্রয়–বিক্রয় তথা ব্যবসার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অর্জিত হয়। এতে প্রথমে অর্থ দ্বারা দ্রব্য–সামগ্রী ক্রয় করে অর্থকে পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়। পরে আবার সে পণ্য বিক্রি করে একে অর্থে রূপান্তরিত করা হয়। রূপান্তরের ঝুঁকি গ্রহণের স্বাভাবিক ফলস্বরূপ বিনিয়োজিত পুঁজি বর্ধিত হয়; আর পুঁজির এই বর্ধিত অংশই হচ্ছে মুনাফা। কিন্তু সুদের বেলায় ক্রয়–বিক্রয়, রূপান্তর ও ঝুঁকি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত; সুদ পুঁজির রূপান্তরের ফল নয়, বরং চাপিয়ে দেয়া হস্তান্তরিত অংশ মাত্র। সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে; ঋণের উপর সময়ের ভিত্তিতে চাপিয়ে দেয়া অতিরিক্ত অংশই সুদ।

www.pathagar.com

মুনাফা ও সুদের ক্ষেত্রে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো, মুনাফা ক্রয়-বিক্রয় থেকে উদ্ভূত হয়; আর ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পদের পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিক্রেতা মূল্য গ্রহণের বিনিময়ে ক্রেতাকে পণ্য বা সেবা দেয়; আর ক্রেতা পণ্য বা সেবার বিনিময়ে মূল্য বা দাম দেয়। বিক্রেতা দাম পায়; ক্রেতা পণ্য বা সেবা পায়। কিন্তু সুদের বিনিময়ে দাতা কিছুই পায় না। অন্যকথায় সুদের কোন বিনিময় নেই। ঋণদাতা যখন ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পরে ১১০ টাকা ফেরত নেয়, তখন সে তার ১০০ টাকার বিনিময়ে ১০০ টাকা ফেরত পায়; কিন্তু অতিরিক্ত ১০ টাকার বিনিময়ে সে ঋণ-গ্রহীতাকে কিছুই দেয় না।

মুনাফা ও সুদের মধ্যে চতুর্থ পার্থক্য হলো,মুনাফা অনির্ধারিত, অনিশ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু সুদ পূর্ব-নির্ধারিত, নিশ্চিত ও ঝুঁকিমুক্ত। উদ্যোক্তা পুঁজি বিনিয়োগ করে একে যখন পণ্যে ও পরে আবার অর্থে রূপান্তরিত করে, তখন সে জানে না যে এ রূপান্তর বা ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা তার কত লাভ হবে, বা আদৌ লাভ হবে কিনা। জেনে-বুঝেই সে অনিশ্চিত লাভ পাওয়ার আশায় ঝুঁকি গ্রহণ করে। এতে কখনো সে তার ধারণামতো বা তার চেয়ে বেশী লাভ যেমন পেতে পারে, তেমনি তার ধারণার বাইরে লোকসান হয়ে সম্পূর্ণ পুঁজিও খোয়া যেতে পারে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা ঋণ প্রদান করার সময়েই ঋণের মেয়াদ ও সুদ নির্ধারণ করে দেয়। ঋণ-গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই এ নির্ধারিত সুদ পরিবর্তন করতে পারে না; বরং মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তাকে সুদসহ আসল ফেরত দিতে হয়। সুতরাং সুদ পূর্ব-নির্ধারিত, নিশ্চিত ও ঝুঁকিমুক্ত।

সুদ ও মুনাফার পার্থক্যের ব্যাপারে সর্বশেষ যে কথাটি উল্লেখযোগ্য তা হলো, ব্যবসায় বিক্রেতা একটি পণ্য একবারই বিক্রি করতে পারে এবং ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী মুনাফাই করুক, তা কেবল একবারই করতে পারে। কিন্তু ঋণদাতা একই মূলধনের উপর বার বার সুদ নির্ধারণ ও আদায় করতে পারে।

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য সংক্ষেপে নিম্নরূপে বিবৃত করা যায় ঃ

১. মুনাফা ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অর্জিত হয়;কিন্তু সুদ অর্জিত নয়,ঋণ ও সময়ের উপর ধার্যকৃত হস্তান্তরিত আয় মাত্র।

২. মুনাফা উদ্যোক্তার পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি গ্রহণের ফল; কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি গ্রহণ করে না, অর্থ ধার দেয় মাত্র।

৩. মুনাফা অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত; কিন্তু সুদ পূর্ব-নির্ধারিত ও নিশ্চিত। এতে ঋণদাতার আয় নিশ্চিত, কিন্তু ঋণ-গ্রহীতার লাভের কোন নিশ্চয়তা নেই।

৪. মুনাফায় লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়; কিন্তু সুদে ঝুঁকি নেই।

www.pathagar.com

৫. ব্যবসায় কোন পণ্যের উপর লাভ একবারই করা যায়; কিন্তু একই মূলধনের উপর সুদ বার বার নির্ধারণ ও আদায় করা যায়।

ইসলামে সকল প্রকার সুদই নিষিদ্ধ

আধুনিককালে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত এবং পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন কোন কোন মুসলমান লেখকও কেবলমাত্র জাহেলিয়াতের যুগে প্রচলিত রিবা নাসিয়াকেই সুদ বলে গণ্য করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁদের মতে, আধুনিককালে উদ্ভাবিত ব্যাংকের সুদ, উৎপাদনশীল ঋণের সুদ, নিম্নহারের সরল সুদ-এসব ধরনের সুদ জাহেলিয়াতের যুগে ছিল না। এগুলোর জন্ম আধুনিককালে হয়েছে। সুতরাং তাঁদের ধারণায়, কুরআনের সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আধুনিককালের এসব সুদের ওপর প্রযোজ্য নয়।এ যুক্তির ভিত্তিতে তাঁরা তাঁদের মতে জাহেলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল না এমন সুদকে ইসলামের নামে চালু রাখতে চান।

এ ধরনের যুক্তি নিঃসন্দেহে পরাজিত ও দাসসুলভ মানসিকতার পরিচায়ক। ইসলাম কোন আচার-সর্বস্ব ধর্ম নয়; বরং ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টির সামগ্রিক সামাজিক জীবনের সকল ব্যাপারেই মৌলিক ও চিরস্থায়ী নীতি নির্ধারণ করেছে। তাই যখন সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তখন এক ধরনের সুদকে বৈধ রেখে অন্য ধরনের সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়নি; বরং সামগ্রিকভাবে সকল ধরনের সুদকেই হারাম করা হয়েছে। রিবা ফদল তো এ জন্যে নিষিদ্ধ যে এর মধ্যে সুদের গন্ধ আছে, আর আছে সুদখোরী মানসিকতা। এ রন্ধ্রপথে গোটা সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদের অনুপ্রবেশ যাতে ঘটতে না পারে সে জন্যে রিবা ফদল নিষিদ্ধ। সুতরাং যেখানে সুদের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা তথা গন্ধটুকু দূর করতে এতো সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, সেখানে পরবর্তীকালে চালু হওয়া কোন কোন সুদকে জায়েজ বলার সুযোগ কোথায় ? তাই সব ধরনের সুদই অবৈধ ও নিষিদ্ধ-তা জাহেলিয়াতের যুগের সুদ হোক বা আধুনিককালের নতুন আঙ্গিকে নতুনভাবে উদ্ভাবিত সুদই হোক। যতক্ষণ কোন লেনদেন, বিনিময় বা চুক্তির মধ্যে সুদী কারবারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে বা সুদখোরী মানসিকতার গন্ধ অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ তা সুদই। লোভ, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও অর্থগৃধ্নু মানসিকতা হতে সুদের জন্ম। সাম্প্রতিককালে সুদকে মুনাফার ছদ্মাবরণে চালাবার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু সুদকে মুনাফা বা অনুরূপ কোন শব্দের পোশাক পরিয়ে দিলেই সুদের বৈশিষ্ট্য বদলে যায় না; বরং সুদ সুদই থেকে যায়। আর তা অবশ্যই হারাম।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোনভাবেই সুদকে অনুমোদন করে না। কারণ সুদ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামী ব্যবস্থা এবং সুদী ব্যবস্থার মধ্যে দর্শনগত মিল যেমন নেই, তেমনি বুনিয়াদী দিক থেকেও এদের মধ্যে কোন মিল নেই।

www.pathagar.com

উভয়ের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং ফলাফলও এক বা অভিন্ন নয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থা এ বুনিয়াদী আক্বিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই হচ্ছেন এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা। এ পৃথিবী এবং এর বাসিন্দা মানুষ তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই বিশ্বের সব কিছুর একমাত্র মালিক। তিনিই মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা করে পাঠিয়েছেন এবং এখানে বসবাসের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, খাদ্য-সামগ্রী ও শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন। মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ ও বিধি-নিষেধ অনুসারেই এ সবের ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর বিধি-নিষেধ শিক্ষা দানের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল (আঃ) পাঠিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশিত পথ হতে বিচ্যুত ও বিপথগামী হয়ে তাঁর রোষানলে পতিত হওয়া মানুষের উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে মানুষের এখতিয়ারে যা কিছু রয়েছে, তা তারা নিজেরা সৃষ্টি করেনি এবং এ সবের ব্যবহারও তারা নিজেদের মর্জিমতো করতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের পরস্পর আন্তরিকতা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা-মূলক আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া সম্পদের উত্তম ব্যবহার এবং অন্যদিকে অপচয়, অপব্যয় ও বিলাসিতার পরিবর্তে মধ্যম পন্থা অনুসরণের নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সততা অবলম্বন করতে হবে যাতে অন্যের কোন অনিষ্ট সাধিত না হয়। সকল কাজে নিয়ত ও উদ্দেশ্য, বুদ্ধি ও শ্রম, উপায় ও পন্থা এবং লক্ষ্যের ব্যাপারে পূর্ণ সততা ও পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। এসবই ঈমানের দাবী। সুদ এমন এক বিষয় যা সরাসরিভাবে খোদায়ী শিক্ষার সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। এটি এমন এক শয়তানী ব্যবস্থা যা শয়তানী শিক্ষার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যবস্থা আল্লাহর জ্ঞানকেই স্বীকার করে না। সুতরাং আল্লাহ মানুষের জন্য যে সব নীতি, নৈতিকতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুদী ব্যবস্থা আদৌ তার পরোয়া করে না। সুদী ব্যবস্থায় এটাই ধরে নেয়া হয় যে আল্লাহর নির্দেশের সাথে মানুষের বাস্তব কাজের সম্পর্ক থাকা জরুরী নয়। দুনিয়ায় মানুষ নিজেই খোদ মোক্তার এবং সর্বেসর্বা। এখানে আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করার কোন দরকার নেই এবং মানব জীবনে আল্লাহর আইনের কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। ফলে সুদী ব্যবস্থায় মানুষ তার আয়-উপার্জন ও পুঁজি গঠনের উদ্দেশ্যে যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, যে কোন উপায়ে অর্থ বৃদ্ধিও করতে পারে এবং যে কোন পথে অর্থ ব্যয় ও ভোগ করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অন্যের স্বার্থ দেখার কোন প্রয়োজন হয় না এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কৃত কোন চুক্তি সে মোটেই মেনে চলতে বাধ্য নয়। এসব কারণে ইসলাম সুদ এবং সুদী ব্যবস্থাকে আদৌ সমর্থন করতে পারে না।

সুদ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর ঘোষণা

সুদের ব্যাপারে ইসলাম যত কঠোর অন্য আর কোন ব্যাপারেই ততটা নয়। বস্তুতঃ শব্দগত দিক থেকেই হোক কিংবা অর্থের দিক থেকেই হোক, কুরআন-হাদীসে এমন

www.pathagar.com

কঠোর ভাষা আর কোন ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয়নি।আল-কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, " অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।" [১৫]

আবার বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে অংশ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি (তোমরা) তা না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের আসল নিতে পার। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না।"[১৬]

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন, " তোমাদের মধ্যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় তারা সবাই সমান পাপী।" [১৭]

আল-কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে সুদকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এতে কোন বিশেষণ ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং উক্ত আয়াতে কোন বিশেষ ধরনের সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে একথা বলার কোন অবকাশ নেই। রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ থেকেও এর কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাই ইসলাম উচ্চহার-নিম্নহার, উৎপাদনশীল-অনুৎপাদনশীল, ব্যাংক ও মহাজনী সুদ নির্বিশেষে সকল প্রকার সুদকেই হারাম করেছে। কোন সুদকে জায়েজ বলার বিন্দুমাত্র অবকাশও ইসলাম রাখেনি।

অন্যান্য ধর্ম ও দার্শনিক দৃষ্টিতে সুদ

প্রাচীনকাল থেকে দুনিয়ায় প্রচারিত সকল ধর্মেই সুদের অপকারিতা তুলে ধরে একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের প্রখ্যাত দার্শনিক, চিন্তাশীল ও গবেষকগণ যুগে যুগে সুদের অশুভ পরিণতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং সুদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আধুনিক বিশ্বের ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীগণ সমবেতভাবে সুদকে মানবতার জন্য একটি অভিশাপরূপে চিহ্নিত করে এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছেন।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সুদকে কৃত্রিম মুনাফা আখ্যায়িত করে বলেছেন যে অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা একটি জালিয়াতি ব্যবসা।[১৮] সুতরাং সুদের কোন বৈধতা থাকতে পারে না। প্ল্যাটো তাঁর 'লজ' নামক পুস্তকে সুদের নিন্দা করেছেন।[১৯] তাছাড়া ক্যাটোস, কাইমীরো, সেনেকা এবং পেটাস প্রমুখ দার্শনিকগণও অর্থকে বন্ধ্যা এবং এর উপর সুদ ধার্য করাকে অযৌক্তিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২০] থমাস একুইনাস সুদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, অর্থ থেকে অর্থের ব্যবহারকে পৃথক করা যায় না। তাই অর্থের ব্যবহার করা মানে অর্থকে নিঃশেষ করা বা খরচ করে ফেলা। এক্ষেত্রে একবার অর্থের ব্যবহারের মূল্য নেয়ার পর আবার অর্থের মূল্য নেয়া হলে, একই দ্রব্যকে দু'বার বিক্রি করার অপরাধ হবে, অথবা দ্বিতীয়বারে এমন দ্রব্যের মূল্য নেয়া হবে যা প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতার দখলে নেই। নিঃসন্দেহে

www.pathagar.com

এটি একটি অবিচার। সুদকে সময়ের মূল্য বলে যারা দাবী করেন, তাঁদের যুক্তি খন্ডন করে তিনি বলেছেন, সময় এমন এক সাধারণ সম্পদ, যার উপর ঋণ-গ্রহীতা, ঋণদাতা ও অন্যান্য সকল মানুষের সমান মালিকানা-অধিকার রয়েছে। এ অবস্থায় ঋণদাতা কর্তৃক সময়ের মূল্য দাবী করাকে তিনি একটি ভন্ডামী ও অসাধু ব্যবসা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২১]

ইটালীর লেখক মিসাব্যু সুদকে এজন্য অযৌক্তিক বলেছেন যে একদিকে অর্থ একটি প্রতীক মাত্র এবং এর নিজস্ব কোন ব্যবহার নেই, অপরদিকে বাড়ীঘর ও আসবাবপত্রের মত অর্থের ক্ষয়-ক্ষতিও হয় না।[২২]

হযরত মূসা (আঃ)-এর মূল কিতাব, যা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত, তা আজ আর কোথাও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে যে দু'টি গ্রন্থকে হযরত মূসার (আঃ) কিতাব বলে চালানো হচ্ছে, সে দু'টিতেও সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুদকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে (Exodus-এর ২২তম স্তবকে বলা হয়েছে, তোমরা যদি আমার কোন লোককে টাকা ধার দাও, যারা গরীব, তবে তোমরা তার উত্তমর্ণ মহাজন হবে না এবং তোমরা তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না।[২৩]

অনুরূপভাবে Dueteronomy-এর ২৩তম স্তবকে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের ভাইকে সুদে ধার দেবে না— অর্থের উপর সুদ, খাদ্য-সামগ্রীর উপর সুদ এবং যে কোন জিনিস, যা ধার দেয়া হয়, তার উপর সুদ।[২৪]

বাইবেলেও সুদকে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "Lend, hoping for nothing again."[২৫] (Luke)

এছাড়া রোমের আইন-প্রণেতাগণ, হিন্দু দার্শনিকবৃন্দ এবং ইহুদী ও খৃষ্টান যাজকগণও সুদকে ঘৃণা করতেন।[২৬] খৃষ্টধর্মের শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুদয় এবং রোমে পোপের নিয়ন্ত্রিত চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। সকল চার্চই তখন এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। সুদ নিষিদ্ধ হবার প্রশ্নে লুথারও খুব দৃঢ় ছিলেন।[২৭]

আধুনিককালে লর্ড কীনসের মতো জগদ্বিখ্যাত অর্থনীতিবিদও সুদের অশুভ পরিণতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং সুদের হারকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।[২৮] তিনি এ আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন যে সঠিকভাবে পরিচালিত সমাজের পক্ষে এক পুরুষকালের মধ্যেই সুদের হারকে শূন্যে নামিয়ে আনা সম্ভব।[২৯]

ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সুদ সম্পর্কে সর্বশেষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে আল-কুরআন। আল-কুরআনের নির্দেশাবলীর সাথে পরিচিত সবাই এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে আল-কুরআন সকল প্রকার সুদকেই হারাম করেছে।[৩০]

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সুদের কুফল

সুদের কুফল অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং ধর্মবিশারদগণ সুদের অশুভ ফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আজকের দুনিয়ায় এটি প্রমাণিত সত্য যে সুদের অনিষ্ট কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর কুফল ও ধ্বংসকারিতা মানব-জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক আঘাত হানে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সূরা রূমের ৩৯ নম্বর আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, "লোকদের অর্থের সাথে শামিল হয়ে বৃদ্ধি পাবে এজন্য তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি পায় না।" সূরা বাকারার ২৭৬ নম্বর আয়াতে আরো বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন।"

এ দু'টি আয়াতের মাধ্যমে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সুদ সম্পদ বাড়ায় না, বরং সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। বস্তুতঃ সুদের দীর্ঘ ইতিহাস আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণার সত্যতাই বাস্তবে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। অর্থনীতিবিদ ও গবেষকগণ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে সুদ একদিকে পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের গতিকে শ্লথ করে দেয় এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি ও শোষণের মাধ্যমে দেশের ভেতরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা, হানাহানি ও যুদ্ধের চরম ধ্বংস বয়ে আনে। সুদের বিভিন্নমুখী অপকারিতা সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

সুদের সামাজিক ও নৈতিক কুফল

১. সুদ স্বার্থপরতা ও কার্পণ্য সৃষ্টি করে ঃ সুদের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, স্বার্থপরতা, অর্থলিপ্সা এবং কার্পণ্যের কারণেই সুদের প্রচলন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পাওয়ার লোভ মানুষের বিচার-বিবেচনা, আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি, এমনকি বিবেককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। সুদখোরদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতা, লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে বিকাশ লাভ করে যে তারা সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে শাইলকের ন্যায় আচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এ রোগ ধীরে ধীরে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পরে এবং সমাজে দয়া-মায়া, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে যারা সুদ দিতে সক্ষম, তাদের জন্য মহাজন এবং পুঁজিপতিদের দ্বারা গঠিত ব্যাংকগুলো ঋণ নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু যারা সুদ দিতে অক্ষম, তাদের পক্ষে ঋণ পাওয়া তো দূরের কথা, মৌখিক সহানুভূতিটুকুও দুর্লভ হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। ডঃ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী এ কথাটাই এভাবে ব্যক্ত করেছেন, "এ ধরনের ঋণ সুদখোর সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।" [১]

২. সুদ ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ঃ সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা সুদের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ কুক্ষিগত করে নেয়। ঋণ–গ্রহীতারা দিনরাত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সামান্য অর্থ উপার্জন করে, তার সবটাই প্রায় মহাজনের সুদ পরিশোধ করার জন্য ব্যয় করতে বাধ্য হয়। কখনো কখনো ঋণের দায়ে তাদের ভিটেমাটি পর্যন্ত মহাজনদের হাতে তুলে দিতে হয়। এছাড়া সুদখোর মহাজন–পুঁজিপতিরা যখন মানুষের চরম বিপদ–আপদ ও সংকটকে চড়া সুদ আদায়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তাদের অমানবিক আচরণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মানুষ তাদেরকে সমাজের বন্ধু ভাবার পরিবর্তে শত্রু মনে করে। আধুনিককালে সুদী ব্যাংকের বিরুদ্ধেও ঘৃণা, ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে।

৩. সুদ নৈতিক অবক্ষয় সাধন করে ঃ সুদী অর্থনীতিতে ঋণগ্রস্ত দরিদ্র জনসাধারণ তাদের কষ্টার্জিত স্বল্প উপার্জন দ্বারা মহাজনের সুদ পরিশোধ করার পর নিদারুণ কষ্টের মধ্যে জীবন–যাপন করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা তাদের নৈতিক চরিত্রের ধ্বংস সাধন করে এবং তাদেরকে অপরাধ–প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়। তাছাড়া সুশিক্ষার অভাবে তাদের সন্তান–সন্ততিরাও অমানুষ–কুমানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। সর্বোপরি সুদী অর্থনীতিতে নিশ্চিত মুনাফা পাওয়ার লোভে অত্যন্ত হীন ও কদর্য খাতেও মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। এসব খাতে মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত বেশী এবং এ থেকে সুদ পরিশোধ করার পরও বিনিয়োগকারীর প্রচুর মুনাফা থেকে যায়। একথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণে সুদী ঋণ সমাজহিতকর এবং জনকল্যাণধর্মী প্রকল্পে বিনিয়োজিত হয় না ; বরং অধিক মুনাফার সম্ভাবনা দেখা গেলে অত্যন্ত হীন ও নীচ এবং সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কাজে অর্থ বিনিয়োগ করতেও সুদী সমাজ পিছপা হয় না। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়, এমনকি কখনো কখনো স্বাভাবিক নৈতিকতা বোধও লোপ পায়।

সুদের অর্থনৈতিক কুফল

সুদের অর্থনৈতিক কুফল সবচেয়ে ব্যাপক ও মারাত্মক। অর্থনৈতিক কুফলকে তিন ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

ক. সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের উপর সুদের প্রভাব;

খ. বন্টনের উপর সুদের প্রভাব; এবং

গ. স্থিতিশীলতার উপর সুদের প্রভাব।

www.pathagar.com

ক. সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের উপর সুদের প্রভাব

১. সুদ সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনে বাঁধা সৃষ্টি করে

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন যে সুদের হার বাড়লে সঞ্চয় বেশী হয় এবং সঞ্চয় বেশী হলে মূলধন বৃদ্ধি পায়। আর একথা ঠিক যে মূলধন বেশী হলে বিনিয়োগ অধিক হয় এবং বিনিয়োগ অধিক হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এভাবে বেকার সমস্যা হ্রাস পায় এবং সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু পরবর্তীকালে নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করলেন যে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন সুদের হারের দ্বারা নির্ধারিত হয় না; বরং সঞ্চয় নির্ভর করে আয়ের উপর ,আয় নির্ভর করে বিনিয়োগের উপর, আর বিনিয়োগ নির্ভর করে ভোগের উপর। অপরদিকে ভোগ নির্ভর করে আয়ের উপর এবং আয় আবার নির্ভর করে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উপর।

এটি হচ্ছে একটি চক্র। সমাজে ভোক্তা জনগণের আয় বাড়লে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজে দ্রব্য-সামগ্রীর কার্যকর চাহিদা বাড়ে। উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রি বেশী হয় এবং তাদের আয় ও লাভ বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত লাভ তারা আবার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। এতে উৎপাদন বাড়ে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। বেকার সমস্যা কমে আসে। যারা কাজ পেলো, তাদের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা আসে; এই ক্রয়-ক্ষমতা আবার চাহিদা বাড়ায়। বিক্রি বাড়ে, মুনাফা বাড়ে এবং আবার বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি হয়।

জে. এম. কীনস দেখিয়েছেন যে সমাজে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে আয় হয়, সমাজ তা দুই ভাগে ব্যয় করে। তারা তাদের আয়ের একটা অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে এবং অপর অংশ বিনিয়োগে খাটায়। এখানে ধরে নেয়া হয়েছে যে সমাজে কেউ অর্থ মজুদ (Hoarding) করে না। সুতরাং তিনি বলেছেন, সমাজের মোট আয়=ভোগ্য-ব্যয়+বিনিয়োগ-ব্যয়। এই মোট আয় থেকে ভোগ্য-ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাই হচ্ছে সে সমাজের সঞ্চয় বা বিনিয়োগ। তিনি বলেছেন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদাই সমান হবে। অর্থাৎ সঞ্চয়=বিনিয়োগ।[২]

এই অবস্থায় কীনস দেখিয়েছেন যে সমাজের আয় অপরিবর্তিত রেখে সঞ্চয় বাড়ানোর লক্ষ্যে যদি সুদের হার বাড়ানো হয়, তাহলে তা সমাজের সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে উদ্বুদ্ধ করবে না।

তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে সুদের হার বাড়ার ফলে অধিক হারে সুদ পাওয়ার আশায় কেউ যদি পূর্বের চেয়ে বেশী সঞ্চয় করে, তাহলে তার ভোগ্য-ব্যয় পূর্বের চেয়ে

www.pathagar.com

অবশ্যই কমে যাবে। ফলে বাজারে পণ্যের চাহিদা ও বিক্রি আগের চেয়ে কমে যাবে এবং বিক্রেতাদের আয় ও মুনাফা উক্ত বর্ধিত সঞ্চয়ের সমপরিমাণে হ্রাস পাবে। সুতরাং বিক্রেতা আগে যে পরিমাণ সঞ্চয় করত, এখন তার চেয়ে কম সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করতে বাধ্য হবে। মোট কথা, কোন নির্দিষ্ট আয়ের প্রেক্ষিতে সমাজে কারো কারো সঞ্চয় বাড়লেও সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় না। একজনের সঞ্চয় বৃদ্ধি অন্যদের আয় সমপরিমাণে কমিয়ে দেবে এবং মোট সঞ্চয় পূর্বে যা ছিল তাই থাকবে।

কীনস আরো দেখিয়েছেন যে কোন নির্দিষ্ট আয়ে সুদের হার বাড়লে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাবে। সে অবস্থায় সমাজের জনসাধারণ যদি তাদের পূর্বের ভোগ্য-চাহিদা পূরণ করতে চায়, তাহলে তাদের ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে ভোগ্য-ব্যয় যে পরিমাণে বাড়বে, বিনিয়োগ-ব্যয় তথা সঞ্চয় সেই পরিমাণে কমে যাবে। অপরদিকে ভোক্তা জনগণ যদি পূর্বের বিনিয়োগ-ব্যয় ঠিক রাখতে চায়, তাহলে তাদেরকে পূর্বের তুলনায় কম ভোগ্য-পণ্য ক্রয় করতে হবে। ফলে পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা ও বিক্রয় হ্রাস পাবে এবং সমপরিমাণ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমে যাবে। তাছাড়া বিনিয়োগকারীগণ বর্ধিত সুদের হারের সাথে তাদের পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার সমতা বিধান করার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হবে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট আয়ে সুদের হার বাড়লে, তা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, এমনকি ভোগ্য-ব্যয়কে কমিয়ে দেবে। এ ব্যাপারে কীনস লিখেছেন, "উচ্চতর সুদের হার প্রকৃত সঞ্চয়কে অবশ্যই কমিয়ে দেবে। কারণ মোট সঞ্চয় নিয়ন্ত্রিত হয় মোট বিনিয়োগের দ্বারা; সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ হ্রাস পাবে। সুতরাং সুদ বৃদ্ধি পেলে তা অবশ্যই আয়কে কমিয়ে দেবে। এতে বিনিয়োগ যতটা কমবে, সঞ্চয়ও ততটাই হ্রাস পাবে। যেহেতু আয় কমে যাবে, সেজন্য এটা অবশ্যই সত্য যে ভোগের হারও কমে যাবে। কিন্তু এর ফলে সঞ্চয়ের জন্য বেশী অর্থ থেকে যাবে—ব্যাপার আসলে তা নয়; বরং সঞ্চয় ও ব্যয় উভয়ই হ্রাস পাবে।" [৩]

২. সুদ বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়

কীনস দেখিয়েছেন যে সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুদের হার কমলে মানুষ অধিক ঋণ নেয় এবং বিনিয়োগ করে; কিন্তু সুদের হার বেড়ে গেলে বিনিয়োগকারীগণ ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করাকে কম লাভজনক মনে করে এবং ঋণ কম নেয়। ফলে বিনিয়োগ কমে যায়। পরের পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে এ অবস্থা দেখানো যেতে পারে।

www.pathagar.com

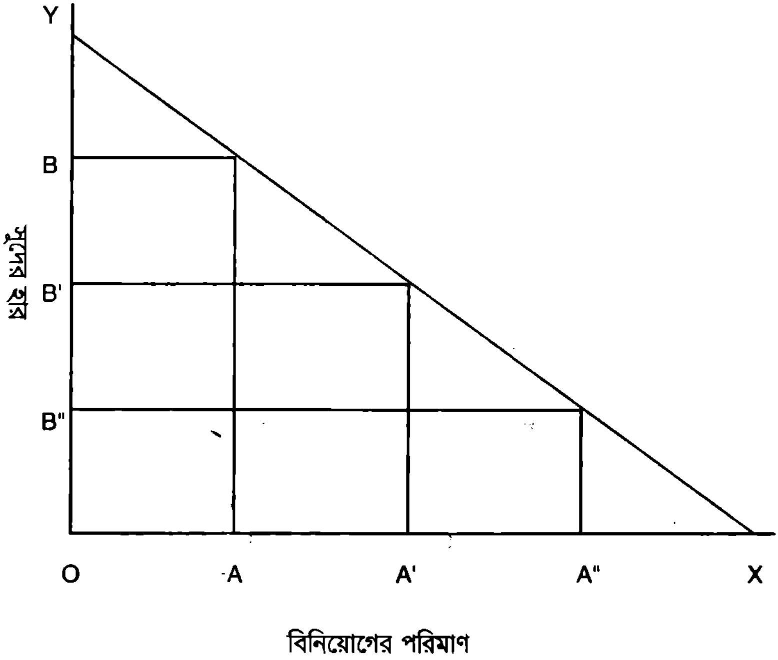

চিত্রে Oy রেখায় সুদের হার এবং Ox রেখায় বিনিয়োগের পরিমাণ দেখানো হলো। দেখা যাচ্ছে যে সুদের হার যখন সর্বোচ্চ OB তখন বিনিয়োগ হয় মাত্র OA পরিমাণ। সুদের হার হ্রাস পেয়ে যখন OB' হয়, তখন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় OA'। এভাবে সুদের হার আরো হ্রাস পেয়ে যখন OB" হয়, তখন বিনিয়োগ বেড়ে হয় OA"। সুদের হার যখন O হয়, তখন বিনিয়োগ হয় পূর্ণ।

এ জন্যই কীনস শূন্য সুদের হারকে পূর্ণ বিনিয়োগ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং সুদের হার শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য সরকারকে আইন প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। [৪]

এ পর্যায়ে কীনস আরো দেখিয়েছেন যে সুদের হার বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ সেখানেই থেমে যায়। [৫] একটি সহজ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে।

www.pathagar.com

সুদের হার ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা

সুদের হার	বিনিয়োগের একক (প্রতি একক ১০০)	পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বা সম্ভাব্য আয়	মোট আয়	লাভ একক থেকে প্রাপ্ত (সুদপ্রদানের পর)	মোট মুনাফা
১	২	৩	৪	৫	৬
২০%	১ম একক	৪০.০০	৪০	২০.০০	২০.০০
২০%	২য় ,,	৩৫.০০	৭৫	১৫.০০	৩৫.০০
২০%	৩য় ,,	২৮.০০	১০৩	০৮.০০	৪৩.০০
২০%	৪র্থ ,,	২০.০০	১২৩	০০.০০	৪৩.০০
২০%	৫ম ,,	১২.০০	১৩৫	–০৮.০০	৩৫.০০
২০%	৬ষ্ঠ ,,	৫.০০	১৩৮	–১৫.০০	২০.০০
২০%	৭ম ,,	০০.০০	১৩৮	–২০.০০	০০.০০
২০%	৮ম ,,	–৮.০০	১৩০	–	

উক্ত ছকে দেখা যাচ্ছে যে বাজারে সুদের হার ২০% ধরে নিলে একজন উৎপাদনকারী যখন ৪র্থ একক পর্যন্ত বিনিয়োগ করে, তখন সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার সমান হয় এবং এখানে তার মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় সর্বোচ্চ টাকা ৪৩.০০। বিনিয়োগকারী এরপর ৫ম একক বিনিয়োগ করলে তার মোট মুনাফা ৪৩.০০ টাকা থেকে ৩৫.০০ টাকায় নেমে আসে। অতঃপর ৬ষ্ঠ ও ৭ম এককে মোট মুনাফা যথাক্রমে টাকা ২০.০০ এবং টাকা ০০.০০–এ নেমে আসে। সুতরাং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে হলে এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ৫ম একক পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে, তার বেশী করবে না। কিন্তু যদি সুদ না থাকে তাহলে উক্ত বিনিয়োগকারী ৭ম একক পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে, কেননা সে ক্ষেত্রে ৭ম এককে সে সর্বোচ্চ আয় ১৩৮.০০ টাকা পাবে।

সুতরাং সুদের হার বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পুঁজি গঠনের উপর সীমারেখা টেনে দেয় এবং সমাজ পূর্ণ বিনিয়োগ, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও সর্বোচ্চ উৎপাদন স্তরে পৌঁছতে পারে না। বাজারে যে সুদের হার চালু থাকে বা যে সুদের হারে ঋণ নিয়ে অর্থ খাটানো হয়, উৎপাদনে লাভের হার তার চেয়ে কম হলে উৎপাদনকারীগণ বিনিয়োগ করে না। সমাজে এমন বহু উৎপাদন ক্ষেত্র আছে যেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করা হলে একদিকে প্রচুর কর্মসংস্থান হতে পারে, এসব পণ্য ও সেবা উৎপাদনের মাধ্যমে মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করা

www.pathagar.com

যায়। কিন্তু মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে কম হওয়ায় এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয় না। একারণে বহু ধনী, এমনকি দরিদ্র দেশেও বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ অলস পড়ে আছে; আর অপরদিকে অসংখ্য মানুষ বেকার রয়েছে এবং বহু প্রয়োজনীয় পণ্য–সামগ্রী ও সেবার অভাবে মানব জাতি কষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছে। [৮]

কীনসের পরে এ বিষয়ে আরো গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় দেখা গেছে, সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সুদের হারের তেমন ভূমিকা নেই। বরং সুদের হার উচ্চ হোক বা নিম্ন হোক— উভয় অবস্থাতেই বিনিয়োগ ও পুঁজি গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি ডঃ এম. ওমর চাপরা দেখিয়েছেন যে সুদ বিলোপ করা হলে পুঁজি গঠন হ্রাস পায় না; বরং সুদ চালু থাকলেই পুঁজি গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়। তিনি দেখিয়েছেন যে সুদ+মুনাফা=মোট আয়। সুতরাং সুদের হার যত বেশী হয়, উদ্যোক্তার মুনাফা ততই কমে যায়, এমনকি সুদ খুব উচ্চ হলে উদ্যোক্তাকে লোকসান দিতে হয়। পরিণতিতে পুঁজি গঠনের গতি মন্থর ও শ্লথ হয়ে আসে। অপরদিকে সুদের হার হ্রাস পেলে সঞ্চয়কারীদের আয় কমে যায় এবং উদ্যোক্তারা বেশী লাভ পায়। বিপুল সংখ্যক সঞ্চয়কারীকে নামমাত্র সুদ দিয়ে তাদের বঞ্চিত করা হয়; এতে সমাজে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বেড়ে যায়। তাছাড়া সুদের হার নিম্ন হলে সাধারণ মানুষ ও সরকার অনুৎপাদনশীল ভোগ্য–ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত হয়, যা মুদ্রাস্ফীতিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তদুপরি নিম্ন সুদের হার অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে এবং পণ্য–সামগ্রী ও শেয়ার বাজারে ফটকাবাজারীর জন্ম দেয়। সর্বোপরি নিম্ন সুদের হার প্রকট শ্রম–বিমুখ বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিয়ে বেকার সমস্যাকে তীব্র করে তোলে। এভাবে নিম্ন সুদের হার ভোগ বাড়িয়ে দেয়, সঞ্চয়ের হারকে নিম্নগামী করে, বিনিয়োগের মান হ্রাস করে এবং মূলধনের ঘাটতি সৃষ্টি করে।

৩. সুদ বিনিয়োগকে অনুৎপাদনশীল ফটকা খাতে ঠেলে দেয়

সুদী অর্থনীতিতে পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ নির্ধারিত, ঝুঁকিমুক্ত ও নিশ্চিত আয় পাওয়ার আশায় জনগণের গচ্ছিত আমানতের এক বিরাট অংশ সরকারী সিকিউরিটি ক্রয়, বিনিময় বিল ভাঙ্গানো, ফটকামূলক কারবার ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব দেখা দেয়। এতে পুঁজির সুদের হার বেড়ে যায়; পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা আরো হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ আবার কমে আসে।

৪. সুদ পুঁজিকে অলস রাখতে উৎসাহিত করে

এছাড়া ব্যাংকারগণ ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে সুদের হার বেড়ে গেলে সে সুযোগে লগ্নি বাড়িয়ে অধিক সুদ পাওয়ার আশায় তাদের পুঁজির একটা বিরাট অংশ নগদ ধরে রাখে। এতে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির ঘাটতি আরো বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

৫. সুদ দীর্ঘমেয়াদী ও ঝুঁকি-বহুল বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়

সুদী অর্থনীতিতে অত্যধিক ব্যয়-সংকুল, ঝুঁকিপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কম হয়। ব্যাংকার ও পুঁজিপতিগণ অধিক পুঁজি দীর্ঘকাল ধরে আটক রাখতে আগ্রহী নয় বলে বড় বড় ব্যয়বহুল শিল্প-কারখানায় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে না। অন্যদিকে অত্যধিক ঝুঁকি থাকার কারণে বিনিয়োগকারীগণও সুদী ঋণের ভিত্তিতে এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে অনীহা দেখায়।

এসব শিল্প-কারখানায় যে বিপুল অর্থের দরকার হয়, তা সুদের ভিত্তিতে ধার নেয়া হলে প্রতি বছর বিরাট অংকের সুদের বোঝা বহন করতে হয়। তাছাড়া এতে গ্যাসটেশন পিরিয়ড বা অবকাশ সময় লাগে প্রায় ২ থেকে ৫ বছর। এ দীর্ঘ সময়ে সুদের বোঝা বেড়ে এমন আকার ধারণ করে যে উৎপাদন লাভজনক হলেও উক্ত সুদের বোঝা বহন করা যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয় না। তদুপরি এসব কারবারে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশী বলে যে কোন সময় বড় ধরনের লোকসানের সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব নয়। লোকসান হলে সুদে-আসলে ঋণের যে অংক দাঁড়ায়, তা পরিশোধ করা আর কখনো সম্ভব হয় না। ফলে উদ্যোক্তা দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়।

৬. সুদ সঞ্চয়কারীদের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে

সুদী অর্থনীতিতে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে বিনা পরিশ্রম ও বিনা ঝুঁকিতে নির্ধারিত সুদ পাওয়া যায়। এই অবস্থা প্রতিভাবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন বহু সঞ্চয়কারীকে অলস ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-কারখানা, তথা উৎপাদন-কাজে যে চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণ দরকার হয়, সঞ্চয়কারীগণ তা করে না; বরং তারা তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রেখে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং আয়ের এপথকেই ঝামেলামুক্ত, নিরাপদ ও সহজ মনে করে। এভাবে সুদের ফলে সমাজ ব্যাপক সংখ্যক যোগ্য সঞ্চয়কারীর চিন্তা, মেধা, শ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এতে অর্থনীতির বেশ ক্ষতি হয়।

৭. সুদ উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে

উপরের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়,বিনিয়োগ সেখানেই থেমে যায়। ফলে সুদের হার শূন্য হলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত আরো যে বিনিয়োগ ও উৎপাদন হতে পারত, সুদী অর্থনীতিতে তা হয় না। অন্যকথায় সুদের হার উৎপাদনকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে দেয় না।

৮. সুদ পুঁজির দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দে বাধা সৃষ্টি করে

অর্থনৈতিক বিচারে ঋণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দক্ষ এবং উৎপাদনশীল প্রকল্প অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু সুদী ব্যাংকগুলো ঋণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কারবারের

www.pathagar.com

দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতা অপেক্ষা সুদসহ আসল ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। তারা প্রধানতঃ ঋণ-গ্রহীতার ঋণ বহন-যোগ্যতার (Credit-worthiness) ভিত্তিতে ঋণ বরাদ্দ করে থাকে। সুদী ঋণদাতা জানে যে ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করে ঋণ-গ্রহীতা উচ্চ হারে লাভ করলেও ঋণদাতা নির্ধারিত সুদের বেশী পাবে না; আবার ঋণ-গ্রহীতার লাভ না হলে বা তার লোকসান হলে ঋণদাতার নির্ধারিত সুদ কমে যাবে না। এ কারণে কারবারের লাভ-লোকসানের প্রতি ঋণদাতার তেমন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু সুদ ও আসলসহ ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা ঋণদাতার জন্য অবশ্যই জরুরী। তাই সুদী ব্যবস্থায় ব্যাংকারগণ প্রধানতঃ ঋণ ফেরত দেওয়ার মত যথেষ্ট সম্পদ যাদের আছে ,তাদেরকেই ঋণ বরাদ্দ করে থাকে। এজন্য দেখা যায় যে কারবারের সুস্থতা ও লাভজনীনতা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করার মত যথেষ্ট সম্পদ ঋণ-গ্রহীতার কাছে না থাকার কারণে তারা ঋণ-মঞ্জুরী পায় না। অপরদিকে যথেষ্ট জামানত দিতে পারলে অদক্ষ এবং অলাভজনক, এমনকি অনুৎপাদনশীল কারবারের জন্য ঋণ-মঞ্জুরী দিতে ব্যাংকারগণ দ্বিধা করেন না। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সুদী ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা নয়, ঋণ বহন-যোগ্যতাকেই ঋণ বরাদ্দের প্রকৃত মানদন্ড ধরা হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোন সুদী ব্যাংকের কাছে নিম্নের তিনটি ঋণ প্রস্তাব পেশ করা হলো ঃ

প্রস্তাব নং	টাকার পরিমাণ	উৎপাদনশীলতা (%)	সিকিউরিটি (%)
১ম প্রস্তাব	১ কোটি টাকা	১০০%	২৫%
২য় ,,	১ ,, ,,	৫০%	৭৫%
৩য় ,,	১ ,, ,,	০%(অনুৎপাদনশীল)	১০০%

এখানে সুদী ব্যাংক প্রথমে ৩ নং প্রস্তাবটি অনুমোদন করবে; কারণ এ প্রস্তাবটিতে ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে ১০০%, যদিও এটি সম্পূর্ণ একটি অনুৎপাদনশীল ঋণ। অতঃপর যদি ঋণ দেয়ার মত অর্থ থাকে এবং আর কোন উত্তম প্রস্তাব না থাকে, তাহলে ব্যাংক ২ নং প্রস্তাবটি অনুমোদন করতে পারে; কেননা এতে উৎপাদনশীলতা ৫০% হলেও ঋণ ফেরত পাবার নিশ্চয়তা রয়েছে ৭৫%। বলা বাহুল্য যে ১ নং প্রস্তাবটি সুদী ব্যাংক হয়তো মঞ্জুর করবেই না; কারণ এতে নিশ্চয়তা মাত্র ২৫%, যদিও এর উৎপাদনশীলতা হচ্ছে ১০০%।

www.pathagar.com

সুদী ব্যবস্থায় এরূপে ঋণ-বরাদ্দের ফলে অর্থনীতিতে দু'ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

প্রথমতঃ, এতে জামানত থাকলে অনুৎপাদনশীল এবং কম উৎপাদনশীল প্রকল্প ঋণ পায়; অপরদিকে জামানত না থাকলে বেশী লাভজনক প্রকল্পও ঋণ পায় না। ফলে অর্থনীতিতে উৎপাদন সর্বোচ্চ হয় না। এছাড়া অনুৎপাদনশীল ও কম উৎপাদনশীল ঋণের অর্থ বাজারে মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে এবং ভোক্তাদের দুর্দশা বাড়িয়ে দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, এ ব্যবস্থায় যাদের বেশী সম্পদ আছে তারাই বেশী ঋণ পায় এবং যাদের সম্পদ নেই তারা দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ঋণ পায় না। ফলে সুদী ব্যবস্থায় কেবল তেলা মাথায় তেল দেওয়ার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সম্পদশালীদের আরো সম্পদশালী বানিয়ে দেয়।

৯. সুদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে

সুদী অর্থনীতিতে সুদকে উৎপাদন খরচের সাথে যোগ করা হয়। অতঃপর উদ্যোক্তাগণ তাদের কাঙ্খিত মুনাফা ধরে পণ্যের দাম ধার্য করে, ফলে সুদমুক্ত অর্থনীতি অপেক্ষা সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য সুদের সমপরিমাণে বেশী হয়। এছাড়া সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, উৎপাদন সেখানেই থেমে যায়। ফলে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ও দাম বৃদ্ধি হয়।

১০. সুদ জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস করে

সুদী অর্থনীতিতে সুদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বেশী হয়। এছাড়া সুদ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করার ফলেও মূল্য-স্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। ফলে সুদী অর্থনীতিতে পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করতে ক্রেতাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং এভাবে অধিক অর্থ ব্যয় করতে করতে ক্রেতা সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা কমে যায়। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে সুদী অর্থনীতিতে বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয় এবং বিপুল শ্রমশক্তি বেকার থেকে যায়। এসব বেকারদের কোন আয় না থাকায় তাদের ক্রয়-ক্ষমতাও থাকে না। ফলে সুদী অর্থনীতিতে জনগণ ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে না; তাদের চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়। এ কথাটাই এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে শার্টের তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে শার্ট ক্রয় করে পিঠ আবৃত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

১১. সুদ চাহিদা হ্রাস করে

সুদী অর্থনীতিতে ক্রেতাদের ক্রয়-ক্ষমতা কম থাকা বা না থাকার কারণে পণ্য-সামগ্রীর কার্যকর চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে যায়। ফলে উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত পণ্যের বিরাট অংশ অবিক্রীত পড়ে থাকে।

www.pathagar.com

সুতরাং সুদী অর্থনীতিতে একদিকে ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে মানুষ তাদের জরুরী চাহিদা পূরণ করতে পারে না; অন্যদিকে কার্যকর চাহিদা না থাকায় বিপুল পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী অবিক্রীত থেকে যায়। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদন হ্রাস করতে হয়; শ্রমিক ছাটাই করে বেকার সমস্যা তীব্রতর করতে হয়। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে আবার চাহিদা হ্রাস পায়; ফলে উৎপাদন হ্রাস ও শ্রমিক ছাঁটাই করতে হয়। অথবা উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করে বাজার ঠিক রাখতে হয়।

১২. সুদ সম্পদ ধ্বংস করতে বাধ্য করে

সুদী অর্থনীতিতে মন্দা এক অনিবার্য পরিণতি; এ মন্দা একবার এসেই শেষ হয় না, বরং বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। মন্দার সময়ে ক্রেতার কাছে ক্রয়-ক্ষমতা থাকে না বলে তারা পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করতে পারে না; অন্যদিকে ক্রেতার অভাবে বিপুল পরিমাণ পণ্য অবিক্রীত অবস্থায় গুদামজাত হয়। কিন্তু এ অবস্থাতেও উৎপাদনকারীগণ বাজার নষ্ট হওয়ার ভয়ে এবং ভবিষ্যতে মুনাফা ক্ষতি হওয়ার আশংকায় তাদের গুদামজাত পণ্য কম দামে বাজারে ছাড়তে রাজী হয় না। তাদের পণ্য গুদামে পচে নষ্ট হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়, কিংবা সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়; তবু কিছুতেই তারা সে পণ্য অভাবী ও প্রয়োজনশীল মানুষের কাছে কম দামে বিক্রি করে না, দান করে দেয়াতো দূরের কথা। এ প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বে সম্পদ ধ্বংসের ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

গাঁথার তাঁর 'Inside Latin America' বইতে উল্লেখ করেছেন, ১৯১৪ সালে ব্রাজিলে বিপুল পরিমাণ কফি উৎপাদিত হলে প্রতি বস্তা ১৩২ পাউন্ড ওজনের মোট চার মিলিয়ন বস্তা কফি ২০,০০,০০০ পাউন্ড খরচ করে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। [৮]

শেখ মাহমুদ আহমদ উল্লেখ করেছেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় ফলের বাগানে প্রচুর ফলের উৎপাদন হলে চেরী ও ষ্ট্রবেরী ফল না তুলে গাছে রেখে পঁচিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়; কিন্তু বেকার শ্রমিকদেরকে সামান্য মজুরীর বিনিময়ে সেগুলো আহরণ করতে দেয়া হয়নি।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, একবার ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচুর কমলালেবু উৎপাদিত হলো। বাজার পড়ে যাবার আশংকায় সেগুলো পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হলো; কিন্তু সে সময়ে সেখানে অসংখ্য শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছিল, পুষ্টিহীন এই শিশুদেরকেও এ কমলা খাবার সুযোগ দেয়া হয়নি।[১০]

বিগত মন্দার সময়েও ধাপে ধাপে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বিনষ্ট করা হয়েছে। ১৯৩৪ সালে ১ মিলিয়ন কমলা লিভারপুল বন্দরের কাছে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়। [১১]

বাজার পড়ে যাবার ভয়ে সম্পদের ধ্বংস সাধনকে অর্থনীতির ভাষায় ডাম্পিং বা খালাস প্রথা বলা হয়। এ কাজ যে নিতান্তই অমানবিক ও নিষ্ঠুর তা কে অস্বীকার করতে পারে! কিন্তু চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করার নামে এ হীন কাজটি করা হয়।

www.pathagar.com

উপরে সঞ্চয়, পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে সুদের কুফল সম্পর্কে আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে সুদী অর্থনীতিতে একদিকে যেমন সর্বাধিক বিনিয়োগ ও বাঞ্ছিত পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব নয়, তেমনি সুদের কারণে মূলধন গঠনও বাধাগ্রস্ত হয়। সুদী ব্যাংকে গচ্ছিত জমার এক বিরাট অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে খাটানো হয় এবং আরেক অংশ নগদ ধরে রাখা হয়; এছাড়া পুঁজি বিনিয়োগ বরাদ্দও যথার্থ দক্ষতাপূর্ণ হয় না এবং নির্ধারিত সুদের শর্ত থাকার কারণে ঝুঁকি–বহুল দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগেও উদ্যোক্তাদের আগ্রহ থাকে না।

সর্বোপরি বেকার সমস্যা সৃষ্টি, ক্রেতাদের ক্রয়–ক্ষমতা হ্রাস এবং চাহিদা সংকুচিত করার মাধ্যমে সুদ উৎপাদন–ধারাকে স্থবির করে দেয়।

খ. বন্টনের উপর সুদের প্রভাব

আয় ও সম্পদ বন্টন ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব অধিকতর মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী উপাদানসমূহের মধ্যে আয় বন্টনে এবং সামগ্রিক বন্টন ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে আশা করা যায়।

১. উৎপাদন-উপাদানসমূহের মধ্যে আয়-বন্টনে সুদের প্রভাব

উৎপাদনের চারটি উপাদান –ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন একযোগে কাজ করার ফলেই উৎপাদন সম্ভব হয় এবং উৎপাদিত সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় এই চারটি উপাদানের মধ্যে বন্টিত হয়। কিন্তু সুদী অর্থনীতিতে এ উপাদানগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের কাজের বিনিময়ে ন্যায্য প্রাপ্ত অংশ পায় না; বরং এ ক্ষেত্রে সুদ দারুণ অবিচার, শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। নীচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

(ক) সুদ বেকার ও আয়হীন লোকের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় ঃ শ্রম হচ্ছে উৎপাদনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। শ্রম ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই উৎপাদন সম্ভব নয়। বস্তুতঃ সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমশক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার করা হলে এর দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়। কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে সুদের হার শূন্য হলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে প্রচলিত সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ সেখানেই থেমে যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ বিনিয়োগ হওয়ার কথা, তা হয় না। ফলে এ বিনিয়োগ হলে যে সব শ্রমিক কাজ পেতো, তারা বেকার থেকে যায়। তাই সুদ বেকারত্ব সৃষ্টি করে শ্রমিকদের আয়হীন করে রাখে এবং সুদের হার যত বাড়ে, বেকার ও আয়হীন শ্রমিকের সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া সুদী অর্থনীতিতে পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ পুঁজির এক বিরাট অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে খাটায় এবং আরেক অংশ নগদ ধরে রাখে। এ কারণেও

www.pathagar.com

উৎপাদনশীল বিনিয়োগ আরো কমে যায় এবং বেকার ও আয়হীন শ্রমিকের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়।

সর্বোপরি সুদ মন্দা সৃষ্টি করে উৎপাদন হ্রাস এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে বেকার ও আয়হীন শ্রমিকের সংখ্যাকে আরো ফাঁপিয়ে তোলে।

(খ) সুদ শ্রমকে ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে ঃ সুদের ফলে একদিকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বেকার ও আয়হীন অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে যে সব শ্রমিক কাজ পায়, তারাও তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরী পায় না। সুদী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কম হয় বলে শ্রমের চাহিদা কম থাকে; এর উপর আবার বেকারত্বের তীব্রতার কারণে শ্রমের যোগান থাকে খুব বেশী। ফলে শ্রমের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। শ্রমিকগণ পানির দামে, এমনকি কখনো কখনো কেবল দু'মুঠো অন্নের বিনিময়ে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কখনো আবার তাও জোটে না।

তাছাড়া সুদের কারণে পণ্যের উৎপাদন খরচ ও দাম বেড়ে যায়। এরপর আবার মজুরী বেশী দিতে গেলে উদ্যোক্তাদের লাভ থাকে না। তাই তারা মজুরী বৃদ্ধি করতে রাজি হয় না। সুতরাং সুদী অর্থনীতিতে শ্রমের মজুরী সর্বদাই পিছিয়ে থাকে, শ্রমিক হয় শোষিত ও বঞ্চিত।

(গ) সুদ পুঁজিপতির সম্পদকে ফাঁপিয়ে তোলে ঃ সুদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ যে ঋণ প্রদান করে, তার সুদের হার ঋণ প্রদানের সময়েই নির্ধারণ করে দেয় এবং ঋণ ও সুদ যাতে যথাসময়ে ফেরত আসে সেজন্য জমি, বাড়িঘর বা মূল্যবান সম্পদ জামানত রাখে। অতঃপর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলে ঋণ-গ্রহীতাকে সুদ সহ এ ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। অন্যথায় ঋণদাতা আইনের আশ্রয়ে জামানত ভাঙ্গিয়ে ঋণ ও সুদ আদায় করে নেয়। এতে ঋণদাতার সুদ থাকে সর্বদাই নির্ধারিত ও নিশ্চিত। ঋণদাতার আয় কখনো কমে না, বরং ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এভাবে ক্রমে পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে; কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সংগঠনের আয়ের কোন নিশ্চয়তা থাকে না । শ্রম তার ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত হয় এবং ভূমি ন্যায্য ভাড়া পায় না।

(ঘ) সুদ সংগঠনের উপর জুলুম চাপিয়ে দেয় ঃ সুদী ব্যবস্থায় পুঁজি সর্বাবস্থায় নির্ধারিত ও নিশ্চিত সুদ পায়; কিন্তু এতে ঋণ- গ্রহীতা সংগঠনের আয়ের কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ঋণের অর্থ খাটিয়ে ঋণ-গ্রহীতা যদি সুদের হার অপেক্ষা বেশী মুনাফা পায়, তাহলে সুদ পরিশোধ করার পরও সে কিছু আয় পায়; কিন্তু যদি সে সুদের হারের চেয়ে কম হারে লাভ পায় অথবা লাভ একেবারে না পায় অথবা যদি তার লোকসান হয়, তাহলেও তাকে ঋণদাতার আসল ও সুদ অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। এতে তার পূর্বে অর্জিত

www.pathagar.com

সম্পদ বিক্রি করে হলেও ঋণ ও সুদ পুরোপুরি ফেরত দিতে হয়। ঋণদাতা তার লোকসানের কোন অংশই বহন করে না। এক পক্ষের লোকসান এবং পূর্ব-অর্জিত সম্পদের বিনিময়ে অন্যপক্ষের নির্ধারিত আয়ের নিশ্চয়তা একটি নিদারুণ জুলুম ছাড়া কিছু নয়।

এ ব্যাপারে সাধারণতঃ এ যুক্তি দেখানো হয় যে পুঁজিপতি ঋণ-গ্রহীতাকে যে অর্থ ধার দিয়েছে, তা নিজে খাটালে তার লাভ হতো।ধার দেয়ার ফলে ঋণ-দাতা তার সেই সম্ভাব্য লাভ (Opportunity cost) থেকে বঞ্চিত হলো। সুতরাং এ বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঋণদাতার সুদ পাওয়া উচিত।

কিন্তু ঋণদাতা নিজে অর্থ খাটালে তার লাভ হবে, এ কথাটাই সত্য নয়; বরং বলা যেতে পারে, তার লাভও হতে পারে বা লোকসানও হতে পারে। যদি তার লোকসান হয়, তাহলে এ লোকসানের বোঝা সম্পূর্ণ তাকেই বহন করতে হবে। বরং তার ব্যয়িত শ্রম, মেধা ও সময়ও বৃথা যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই অর্থ অন্য কেউ খাটিয়ে লোকসান দিলে পুঁজিপতি সে লোকসানের কোন অংশ তো বহন করেই না, বরং পূর্ব-নির্ধারিত সুদসহ সাকুল্য আসল আদায় করে ছাড়ে। অথচ ঋণ দেওয়ার পর তাকে এ বিষয়ে আর কোন চিন্তা-ভাবনা, শ্রম ও সময় কিছুই করতে হয় না। তবু তার আয় হয় নিশ্চিত। কিন্তু যে ঋণ-গ্রহীতা তার শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে কারবার পরিচালনা করে, সে তার শ্রম ও সময় হারাবার সাথে সাথে যে মুনাফা হয়নি তাও পরিশোধ করতে বাধ্য হয়; একে নিষ্ঠুর জুলুম ছাড়া আর কি বলা যায়!

(ঙ) সুদ ভূমিকে ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে ঃ উৎপাদনের আর একটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে ভূমি। সুদী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কম হয় বলে ভূমির চাহিদা কম এবং ভাড়াও কম থাকে। ফলে ভূমির মালিকগণ ন্যায্য ভাড়া পায় না। তাছাড়া ভূমির মালিকগণ সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে ভূমিতে উৎপাদন কাজে খাটানোর পর যে আয় হয়, তা থেকে সুদ ও আসল পরিশোধ করা প্রায়ই সম্ভব হয় না; তাই ভূমির মালিককে ভূমি বিক্রি করে ঋণ ও সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য হতে হয়। এভাবে সুদী সমাজে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ভূমির মালিক ক্রমে ভূমিহীন হয়ে পড়ে এবং পুঁজিপতিরা একাধারে পুঁজি ও ভূমির মালিক হয়ে বসে। ক্রমে সব ভূমি পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।

এ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সুদী অর্থনীতিতে পুঁজিপতিগণ তাদের পুঁজি ধার দিয়ে পূর্ব-নির্ধারিত হারে নিশ্চিত সুদ পায় এবং তাদের সম্পদ কেবল বাড়তেই থাকে। অথচ উদ্যোক্তার বেলায় তার সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই; বরং সর্বস্ব হারিয়ে তার পথে বসার ঝুঁকি রয়েছে প্রচুর। কারবারে লোকসান হওয়ার দরুন ঋণের সাকুল্য অর্থও যদি খোয়া যায়, তাহলেও উদ্যোক্তার রেহাই নেই; পূর্বে অর্জিত যাবতীয় সম্পদ বিক্রি করে দেউলিয়া হয়ে গেলেও পুঁজিপতির পাওনা সুদ ও আসল তাকে

www.pathagar.com

অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। সুদী অর্থনীতিতে শ্রমিকগণ তাদের একমাত্র সম্বল শ্রম খাটিয়ে অর্থনৈতিক তৎপরতায় অংশ নেয়, উৎপাদন বৃদ্ধি করে; কিন্তু শ্রমের ন্যায্য মজুরী থেকে তারা হয় বঞ্চিত। মেহনতি মানুষের শ্রমলব্ধ সম্পদে পুঁজিপতিরা বৈভব গড়ে তোলে, আর শ্রমিক তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। এ ছাড়া ভূমির মালিকগণও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমে নিঃস্ব ও ভূমিহীনের কাতারে শামিল হয়। মোটকথা, সুদ উৎপাদনের তিনটি উপাদান- ভূমি, শ্রম ও সংগঠনকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে একমাত্র পুঁজিপতিদের সম্পদ ক্রমাগতভাবে বর্ধিত করে দেয়।

২. সার্বিক বন্টনে সুদের প্রভাব

সুদ উৎপাদন উপাদানের মধ্যে আয়-বন্টনে অবিচার ও বৈষম্য সৃষ্টি করেই ক্ষ্যান্ত হয় না, সম্পদের সার্বিক বন্টন ক্ষেত্রেও চরম বৈষম্য সৃষ্টি করে। নিম্নে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে।

(ক) সুদ পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে ঃ আধুনিককালে ব্যাংকিং ব্যবসার দিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। পুঁজিপতিগণ প্রথমে মাত্র কয়েক কোটি টাকার নিজস্ব মূলধন নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে। অতঃপর জনগণের নিকট থেকে বিনা সুদে অথবা নামমাত্র সুদের বিনিময়ে হাজার হাজার কোটি টাকা জমা হিসেবে গ্রহণ করে। এবং এ অর্থ উচ্চ সুদের হারে খাটিয়ে বিপুল আয় করে। ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয় না, বরং ব্যাংকারগণ বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি (Multiple credit creation) পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের জমাকৃত অর্থকে বহুগুণে বর্ধিত করে ঋণ দেয় এবং তার উপর সুদ আদায় করে রাতারাতি বিপুল অর্থের মালিক হয়ে বসে। এভাবে সুদ দেশের নাগরিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলো ব্যাংকে জমা করে এবং যে অর্থ আসলে নেই, তার উপর সুদী আয় লাভের সুযোগ করে দেয়।

(খ) সুদ জমাকারীদের আয় কমিয়ে দেয় ঃ ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে ব্যাংকারগণ ঋণ-গ্রহীতার কাছ থেকে যে সুদ নেয়, সে সুদের বোঝা পণ্য-সামগ্রীর মূল্যের সাথে ক্রেতা-জনগণই বহন করে থাকে। সুতরাং ব্যাংকে অর্থ-জমাকারীগণ জমাকারী হিসেবে যে সুদ পায়, দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রেতা হিসেবে তার চেয়ে অধিক হারে সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। এভাবে সুদ জমাকারীদের সম্পদ কমিয়ে তা পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত করে দেয়।

(গ) সুদ ভোক্তাদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত করে ঃ ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে সুদী অর্থনীতিতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বেকার থাকে এবং যে সব শ্রমিক কাজ পায়, তারাও তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত

www.pathagar.com

হয়; তাছাড়া এখানে ভূমির মালিক তার ন্যায্য অংশ পায় না এবং উদ্যোক্তাদের সকলেই লাভ করতে পারে না। মোটকথা, সুদী অর্থনীতিতে শ্রমিক, ভূমির মালিক এবং উদ্যোক্তাগণ যে আয় পায়, ভোক্তা হিসেবে দ্রব্য–মূল্যের উপর সুদ আকারে সে আয়ের একটা বিরাট অংশও আবার পুঁজিপতিদের হাতে গিয়েই জমা হয়। একদিকে সুদ থাকার কারণে তারা স্বল্প আয় পায়; অন্যদিকে এ স্বল্প আয়টুকু সুদ দিতেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে এরা সকলেই ক্রমে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে, আর পুঁজিপতিদের সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে।

(ঘ) সুদ জনগণের সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত করে ঃ কোন দেশের সরকার সাধারণতঃ তিনটি কারণে ঋণ গ্রহণ করে থাকে ঃ (১) বাজেট ঘাটতি পূরণ বা ব্যয় নির্বাহ, (২) সরকারী খাতে অবস্থিত শিল্প–কারখানায় এবং সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং (৩) কোন দুর্যোগ মুকাবিলা এবং যুদ্ধের ব্যয় বহন করার জন্য।

প্রথম ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের অর্থ যেহেতু বিভিন্ন ব্যয়–নির্বাহের জন্য খরচ করা হয়, সেজন্য এ ক্ষেত্রে সরকার কোন আর্থিক আয় পায় না। এ ঋণ ও সুদ পরিশোধ করার জন্য সরকার জনগণের উপর কর আরোপ করে এবং কর আকারে এ সুদ জনগণের কাছ থেকে আদায় করে পুঁজিপতিদের প্রদান করে।

সরকার শিল্প–কারখানায় অর্থ যোগান দেয়ার জন্য যে ঋণ নেয়, তাতে শিল্প–কারখানায় মুনাফা হলে তা থেকে ঋণ ও সুদ পরিশোধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু যদি মুনাফা সুদের হারের চেয়ে কম হয় অথবা যদি লোকসান হয়, তাহলে সরকারকে এ ঋণ ও সুদ পরিশোধ করার জন্য অবশ্যই নতুন করের আশ্রয় নিতে হয়। এভাবে সরকারী শিল্প–কারখানার লোকসানের বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে পুঁজিপতিদের আয়–বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হয়।

সমাজকল্যাণমূলক এবং জনহিতকর কাজের জন্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে, সে ঋণের সামাজিক মূল্য যথেষ্ট হলেও এ থেকে কোন আর্থিক আয় পাওয়া যায় না। ফলে এ সব ঋণ ও সুদ কর আকারে জনগণের কাছ থেকে আদায় করে পুঁজিপতিদের দেয়া হয়।

সর্বশেষে, যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলা করার জন্য গৃহীত সুদভিত্তিক সরকারী ঋণ কিছুই উৎপাদন করে না। যুদ্ধের ঋণ তো আসলে পুড়ে ভস্ম করা হয়। অতঃপর এ ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করার জন্য সরকারকে কয়েক পুরুষ ধরে জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করে পুঁজিপতিদের দিতে হয়।

এভাবে সুদ বিভিন্ন প্রকার কর আকারে জনগণের আয় থেকে অর্থ বের করে এনে পুঁজিপতিদের সম্পদের পাহাড়কে আরো স্ফীত করে তোলে।

www.pathagar.com

(ঙ) সুদ উদ্যোক্তা ও ধনীর সংখ্যা কমিয়ে দেয় ঃ সুদ ধনীদের আরো ধনী এবং গরীবদের আরো গরীব বানায়। শুধু তাই নয়, বরং ক্রমাগতভাবে ধনীদের সংখ্যা কমিয়ে গুটিকয়েক পরিবারের হাতে দেশের গোটা সম্পদ তুলে দেয় এবং গরীবের সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে কয়েকটিমাত্র পরিবার ছাড়া দেশের সকল মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়।

প্রথমতঃ, সুদী অর্থনীতিতে বিভিন্ন হারের সুদ চালু থাকে এবং তা ধনিক শ্রেণীর পক্ষে মূল্য–বৈষম্য সৃষ্টি করে। সমাজে যারা ধনী এবং অধিক ঋণ বহন করার যোগ্য, তাদেরকে সহজ শর্তে এবং কম সুদের হারে ঋণ দেয়া হয়। অপরদিকে সমাজে যাদের সম্পদ অপেক্ষাকৃত স্বল্প ও ঋণ বহন–যোগ্যতা কম, তাদেরকে ঋণ দিতে অধিক হারে সুদ দাবী করা হয়। ফলে যারা ধনী এবং বৃহৎ কারবারের মালিক তারা কম সুদে অধিক ঋণ পায় এবং আরো ধনী হয়ে ওঠে। কিন্তু ঋণ বহন–যোগ্যতা কম বলে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের মালিকগণ অধিক সুদে কম মূলধন পায়। ফলে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে এরা এক সময় অচল হয়ে পড়ে এবং কারবার গুটাতে বাধ্য হয়। এভাবে সুদের স্বেচ্ছাচারী আচরণের ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারবারের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যায় এবং বড়রা আরো বড় হয় এবং ক্রমে সমস্ত সম্পদ এদের হাতেই পুঞ্জীভূত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সুদী ব্যবস্থায় ঋণদাতাগণ এমন অনেক অনুৎপাদনশীল ঋণ প্রদান করে যেগুলো থেকে কোন উৎপাদন বা লাভ পাওয়া যায় না। এছাড়া অনেক উৎপাদনশীল ঋণ এমনও হয়, যেখানে লাভ সুদের হারের চেয়ে কম হয় অথবা মোটেই লাভ হয় না, কখনো কখনো লোকসানের কারণে গোটা মূলধনই খোয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে ঋণ–গ্রহীতাকে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ঋণদাতার সুদ ও আসল পরিশোধ করতে হয়। এভাবে এসব উদ্যোক্তা ও ঋণ–গ্রহীতার সম্পদ ঋণদাতার কাছে হস্তান্তরিত হয়ে ঋণ–গ্রহীতার সম্পদ কমিয়ে দেয় এবং ঋণদাতার সম্পদ ফাঁপিয়ে তোলে। এসব ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা বিরল নয় যেখানে সুদ ও আসল পরিশোধ করতে গিয়ে উদ্যোক্তা দেউলিয়া হয়ে নিঃস্বদের কাতারে শামিল হয়েছে।

উপরে সার্বিক বন্টনের ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা থেকে দেখা যায়, সুদ উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে অবিচার ও বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং দাম, কর ও সুদের আকারে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে এনে পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত করে দেয়। এভাবে সমাজে গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে গোটা সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। অপরদিকে সমাজের সাধারণ মানুষ শোষিত–বঞ্চিত সর্বহারায় পরিণত হয়। এজন্যই বলা হয়েছে যে 'সুদ পুঁজিবাদী শোষণের বড় হাতিয়ার।'

গ. স্থিতিশীলতার উপর সুদের প্রভাব

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু সুদ অর্থনীতিকে অস্থির করে তোলে, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিবেশ ব্যাহত করে এবং অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেয়। স্থিতিশীলতার উপর সুদের প্রভাব নীচে আলোচনা করা হলো।

www.pathagar.com

১. সুদ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়

সুদী অর্থনীতিতে স্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বেশী থাকে। এরপর আবার মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির মাধ্যমে সুদ দ্রব্যমূল্যকে আকাশচুম্বী করে দেয় এবং জনগণের দুঃখ-দুর্দশাকে দুঃসহ করে তোলে।

সুদী অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানত সৃষ্টির ক্ষমতাবলে অনেক সময় অধিক সুদ পাওয়ার লোভে বিপুল পরিমাণ আমানত সৃষ্ট ঋণ দেয়। এতে বাজারে অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া সুদী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেবল নিশ্চয়তার ভিত্তিতে অনেক অনুৎপাদনশীল ঋণ, ভোগ্য-ঋণ, সরকারী বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণ, যুদ্ধ-ঋণ ইত্যাদি দিয়ে থাকে। এসব ঋণের সাথে দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সংগতি থাকে না। এ ঋণ বাজারে অর্থ সরবরাহ বাড়ায়, কিন্তু পণ্য-সামগ্রী বৃদ্ধি করে না। ফলে বাজারে দ্রব্য-সামগ্রীর তুলনায় অর্থের যোগান বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

মুদ্রাস্ফীতিকালে উৎপাদনকারীগণ বেশী দামে পণ্য বিক্রি করে লাভবান হয় এবং ব্যাংকের পক্ষেও অধিক হারে সুদ আদায়ের সুবিধা হয়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ভোক্তা-জনগণের দুর্দশা বাড়িয়ে দেয়। মুদ্রাস্ফীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ডঃ এম. ওমর চাপরা লিখেছেন, "মুদ্রাস্ফীতি মানেই হচ্ছে হিসাব-নিকাশের সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ একক হিসেবে ভূমিকা পালনে মুদ্রার ব্যর্থতা। মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাকে বকেয়া পরিশোধের একটি অসম মানদন্ড এবং সঞ্চয়ের একটি অনির্ভরযোগ্য বাহনে পরিণত করে। এটি ধীরে ধীরে আর্থিক সম্পদের ক্রয়-ক্ষমতার ক্ষয় সাধন করে এবং কিছু লোককে অন্যদের উপর জুলুম করার সুযোগ করে দেয়। মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রা ব্যবস্থার দক্ষতা যে পরিমাণে ব্যাহত করতে সক্ষম হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই সামাজিক কল্যাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদনশীল কর্ম-প্রচেষ্টার পরিবর্তে ফটকা কারবারকে পুরস্কৃত করা এবং আয়-বৈষম্যকে তীব্রতর করার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নৈতিক মূল্যবোধকেও বিকৃত করে দেয়।" [১২]

২. সুদ মুদ্রানীতিকে বিকল করে দেয়

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মুদ্রা সরবরাহের মাধ্যমে অর্থের মূল্যকে স্থিতিশীল রাখা, দ্রব্যমূল্যকে জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার সীমার মধ্যে নামিয়ে আনা এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মুদ্রানীতি চালু করে থাকে। কিন্তু সুদ এই মুদ্রানীতির কার্যকারিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাংক হার (Bank Rate) বা বিধিবদ্ধ জমার হার (Statutory Reserve Ratio) বাড়িয়ে দেয়, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তাদের সুদের হার বৃদ্ধি করে। এতে মুদ্রা সরবরাহ হ্রাস পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি কমে আসে

www.pathagar.com

বটে, কিন্তু সুদের হার বেড়ে যায় এবং বিনিয়োগ হ্রাস পায়। আর দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সুদের হার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় এবং বিনিয়োগে বাধার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ব্যাংক হার বা বিধিবদ্ধ জমার হার হ্রাস করে, তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের হার কমিয়ে দেয়। ফলে ফটকামূলক কারবারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং বাজারে অর্থের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে, দ্রব্য-সামগ্রীর দাম জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে মুদ্রার পরিমাণের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ডঃ এম. ওমর চাপরা এ সম্পর্কে লিখেছেন, "The Central Bank can either control the rates of interest or the stock of money........Experience has indicated that it is impossible to regulate both in such a balanced manner that inflation is checked without hurting investment."[১৩] এভাবে সুদ মুদ্রানীতিকে বিকল করে দেয়।

৩. সুদ মন্দা সৃষ্টি করে

অর্থনীতিবিদগণ দেখিয়েছেন যে ঋণযোগ্য অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা সুদের হার নিরূপিত হয়। কোন দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঋণের চাহিদা কম থাকে এবং সুদের হারও কম হয়। এ সময়ে উৎপাদন পরিমাণ কম সুদের ঋণ দিয়ে বিনিয়োগ করে। সুদের হার কম থাকায় দ্রব্য-মূল্য কম হয়, দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বিক্রি বেশী হয়। অধিক মুনাফা পেয়ে উৎপাদনকারীগণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সুযোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তারা আরো বেশী ঋণ গ্রহণ ও বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। ফলে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুযোগ বুঝে ব্যাংক-মালিকগণ সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। এভাবে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদের হারও বাড়তে থাকে। ক্রমে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয় বেড়ে যায়। উৎপাদনে মুনাফার সম্ভাবনা লোপ পায়। ফলে বিনিয়োগ মারাত্মকভাবে কমে যায়। উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে।

অপরদিকে উৎপাদন-ব্যয় বাড়ার সাথে সাথে দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে এবং ক্রেতাদের ক্রয়-ক্ষমতা কমতে থাকে। বাজারে পণ্য-সামগ্রীর বিক্রয় হ্রাস পায় এবং অবিক্রীত পণ্যের স্তূপ জমতে থাকে। মানুষের সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকে না, সঞ্চয়ের ইচ্ছাও বিলুপ্ত হয়। পুঁজি গঠন রুদ্ধ হয়ে যায়। পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ তাদের ঋণ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ঋণ-গ্রহীতাদের সাহায্য করার পরিবর্তে তারা ঋণ ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। এ অবস্থা অর্থবাজারে আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং

www.pathagar.com

অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। এভাবে এক সার্বিক মহামন্দায় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

অর্থনীতির চরম সংকটকালে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় লোকসান এড়ানোর জন্য ব্যাংকারগণ সুদের হার হ্রাস করে। সুদের হার হ্রাস পাওয়ায় আবার বিনিয়োগ বাড়ে এবং অর্থনীতি ধীরে ধীরে মন্দা কাটিয়ে তেজী হয়ে ওঠে। কিন্তু পুঁজির চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে আবার সুদের হার বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতি আবার মন্দার সম্মুখীন হয়। এভাবে অর্থনীতি বারবার মন্দা-অবস্থার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

বস্তুতঃ সুদের হার বাজারে স্থির থাকে না; প্রতিনিয়তই ওঠা-নামা করে। অর্থনীতি যখনই একটু চাঙ্গা হয় এবং পুঁজির চাহিদা বাড়ে, তখনই সুদের হার বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পুঁজির চাহিদা কমার সাথে সাথে সুদের হারও কমে যায়। সুদের হারের এই অস্থিরতার দরুন গোটা অর্থনীতিই অস্থিরতার শিকারে পরিণত হয়। এ অবস্থায় সুদভিত্তিক বিনিয়োগ, পণ্য-মূল্য এবং মুদ্রা বিনিময় হারে দারুণ অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়।

৪. সুদ শেয়ার বাজারে ফটকা কারবারের সৃষ্টি করে

শেয়ার বাজারে ফটকাবাজারীর জন্ম হয় সুদী ঋণ ব্যবস্থা ও মার্জিনে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ থেকে। মার্জিনে শেয়ার ক্রয়ের বেলায় ক্রেতাকে তার ক্রীত শেয়ারের সাকুল্য দাম নগদ পরিশোধ করতে হয় না, বরং শেয়ারের দামের একটা অংশ দালালের কাছে জমা রাখলেই চলে। দামের বাকী অংশ দালালের পক্ষ থেকে ক্রেতাকে ধার দেওয়া হয়। দালাল সেই শেয়ারগুলো জামানত রেখে ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে সমপরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়ে থাকে।

মার্জিনে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার দরুন ক্রেতা অল্প অর্থ জমা দিয়ে বিপুল পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করতে পারে; আর সুদী ব্যবস্থা চালু থাকায় দালালের পক্ষে সুদী ঋণ নিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ শেয়ারে খাটানো সম্ভব হয়। অতঃপর প্রয়োজনীয় মার্জিনের হার অথবা সুদের হারে অথবা একই সাথে মার্জিন ও সুদের হারে যদি কোন পরিবর্তন হয়, তাহলে স্টক বাজারে নতুন করে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়।

মার্জিনের হার অথবা সুদের হার হ্রাস পেলে শেয়ার বাজার গরম হয়ে ওঠে। ফটকা-কারবারীরা অধিক পরিমাণে শেয়ার ক্রয় করতে শুরু করে। ভবিষ্যতে সুদের হার বৃদ্ধি পাবে আশায় ব্যাংকাররাও স্বল্পমেয়াদী ফটকা শেয়ার-কারবারীদের ঋণ দিতে এগিয়ে আসে। ফলে শেয়ার বাজার আরো গরম হয়। এ সময়ে শেয়ার বাজারের স্থিতিশীলতা বহাল করার লক্ষ্যে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় এবং সুদের হার ও মার্জিনের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে শেয়ারের বাজার কমে যাওয়ার আশঙ্কায় ফটকা-কারবারীরা দ্রুত তাদের শেয়ার বিক্রি করতে এগিয়ে আসে। বাজারে শেয়ারের সরবরাহ বেড়ে যায় এবং আশংকা ছড়িয়ে

www.pathagar.com

পড়ার দরুন হঠাৎ করে শেয়ার বাজারে বিপর্যয় দেখা দেয়। রাতারাতি শেয়ারের দাম পড়ে যায়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া গোটা অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

শেয়ারের দাম পড়ে যাওয়ায় শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনের ঝুঁকির তুলনায় শেয়ার বাজারে সস্তায় শেয়ার কেনা যায়; ফলে নতুন বিনিয়োগ কমে আসে-জাতীয় প্রবৃদ্ধির হারও কম হয়।

৫. সুদ পণ্য বাজারে ফটকা কারবারের জন্ম দেয়

সুদের হারের অস্থিরতা পণ্য বাজারকে প্রভাবিত করে। সুদের হার কমলে পুঁজিপতিরা দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীল ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী ফটকা কারবারের জন্য ঋণ দেয়। ফটকা-কারবারীরা কম সুদে ঋণ নিয়ে একদিকে শেয়ার ক্রয় করে, অন্যদিকে পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে মজুদ করে রাখে। বাজারে পণ্য-সামগ্রীর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয় এবং পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এসময়ে আর্থিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে সুদের হার বাড়ানো হয়। দ্রব্যমূল্য আরো এক ধাপ বেড়ে যায়। এই সুযোগে ফটকা-কারবারীরা মজুদকৃত পণ্য চড়া মূল্যে বিক্রয় করে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হয়। অপরদিকে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বেড়ে যায়।

৬, সুদ বিনিময়-হারকে অস্থির করে তোলে

সুদের হারের ঘনঘন ওঠানামা মুদ্রার বিনিময়-হারকে অস্থির করে তোলে এবং বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণের সকল প্রচেষ্টা নিস্ফল হয়। যদি 'ফিক্সড প্যারিটি' পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়, তাহলে সুদের হার বাড়লে বর্ধিত সুদ পাবার আশায় বিদেশ থেকে গরম অর্থ (Hot-Money) দেশে প্রবেশ করে এবং মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে। অন্যদিকে সুদের হার কমলে বেশী সুদ পাওয়ার আশায় দেশের অর্থ বাইরে চলে যায়। এ অবস্থায় নির্ধারিত বিনিময় হার ঠিক রাখতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বিপুল লোকসান দিতে হয়। ফলে নির্ধারিত বিনিময়-হার বহাল রাখা সম্ভব হয় না।

বিনিময়-হার যদি অনির্ধারিত (Floating) হয়, তাহলে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদের হারের ওঠানামা এবং ফটকা কারবারের প্রভাবে এ হার প্রতিনিয়তই ওঠানামা করতে থাকে। দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থার সাথে বিনিময়-হারের সঙ্গতি থাকে না।

বিনিময়-হারের এই অস্থিরতার দরুন ভবিষ্যত বিনিময়-হার সম্পর্কে ধারণা করা দুরূহ হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ ও উৎপাদন-পরিকল্পনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মন্দায় নিপতিত অর্থনীতির জন্য অবস্থা আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করে। পরিস্থিতি এতই

www.pathagar.com

নাজুক হয়ে পড়ে যে সুদের হার না কমালে বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে গতি ফিরে আসে না—মন্দা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয় না; অন্যদিকে সুদের হার না বাড়ালে অর্থের বহির্গমন ঠেকানো যায় না এবং মুদ্রার মান বহাল রাখা সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ সুদের হারের ওঠানামা বিনিময় হারে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশকে অনিশ্চিত করে তোলে; বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পুঁজি-গঠনকে নিরুৎসাহিত করে এবং সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনকে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক পথে পরিচালিত করে।

সুদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কুফল

১. সুদ ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে

ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, সুদ সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং দেশের প্রায় সকল সম্পদ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত করে দেয়। অতঃপর প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলে এসব পুঁজিপতিরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ অবস্থায় সুদী সমাজে গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র থাকে না, সব কিছু পুঁজিপতিদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় প্রেস, প্লাটফরম, এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোও পুঁজি ও ক্ষমতার হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। পুঁজিপতিরা যেভাবে চায়, সে ধরনের সরকারই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারের যাবতীয় পলিসিও পুঁজিপতিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এ অবস্থা কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, বরং আন্তর্জাতিক সুদী ঋণ-ব্যবস্থার ফলস্বরূপ ঋণ-গ্রহীতা দরিদ্র দেশসমূহের সম্পদও ক্রমাগতভাবে ঋণদাতা ধনী দেশগুলোর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ফলে ধনী দেশগুলো অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাথে সাথে বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী লিখেছেন, "অতঃপর এ শক্তির জোরে তারা বিভিন্ন দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ে খেলা করে। তারা ইচ্ছামত যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, ইচ্ছামত দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধায়, আবার ইচ্ছামত যে কোন সময় সন্ধি স্থাপন করায়। নিজেদের অর্থলিপ্সার দৃষ্টিতে যে জিনিসকে বাঞ্ছনীয় মনে করে, তার প্রচলন বাড়ায় ও বিকাশ সাধন করে। আবার যেটিকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে, তার বিকাশ লাভের সকল পথই বন্ধ করে দেয়। তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কেবল বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্য ও জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মচর্চা কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় পার্লামেন্ট-সর্বত্রই তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।"[১৪]

২. সুদ বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করে

সুদ দেশের ভেতরে যেমন অধিকাংশ মানুষকে শোষণ করে কতিপয় পুঁজিপতির হাতে সকল সম্পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দেয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ঋণ-গ্রহীতা

www.pathagar.com

দরিদ্র দেশগুলোকে শোষণ করে বিশ্বের প্রায় সব সম্পদ ও ক্ষমতা ধনী ঋণদাতা দেশের হাতে কুক্ষিগত করে দেয়। বস্তুতঃ বিশ্বের ধনী দেশগুলোর ক্রমে আরো ধনী হয়ে ওঠা এবং দরিদ্র দেশসমূহের আরো দরিদ্র হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ সুদ। ডঃ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী লিখেছেন, "The regime of interest has been a major factor responsible for the worsening distribution of income and wealth within and between nations." [১৫]

সুদের এ শোষণ ও বৈষম্যের ফলে দেশের ভিতরে পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধনী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো তা হানাহানি, যুদ্ধ ও ধ্বংস বয়ে আনে। ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, সুদখোরদের অর্থলিপ্সা বিশ্বের বহু সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেছে। জি. ফেরো তাঁর 'দি গ্রেটনেস এন্ড ডিক্লাইন অব রোম' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে সুদখোরদের অশুভ তৎপরতাই রোম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছে।"[১৬]

ম্যাকনায়ার উইলসন ফরাসী সাম্রাজ্য ও নেপোলিয়নের পতনের জন্য সুদের প্রভাবকে দায়ী করেছেন।[১৭] সুদী ঋণ ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে আর্থার কিনষ্টন বলেছেন, "I am against usary in every form. Usary has been the curse of the world from the beginning; it has broken other empires that this, and it is going to break this empire." [১৮]

সুদী ঋণব্যবস্থার ফলে উত্তরের কয়েকটি ধনী দেশের সাথে দক্ষিণের বিপুল সংখ্যক দেশের বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং বিশ্বের স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলো সুদ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ঋণকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করছে এবং বিশ্বসমাজ একটি ভিন্ন ও উন্নততর অর্থ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যাংক যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং, অতি-ব্যাংকিং (Extra Banking), অ-ব্যাংকিং (Non-Banking) কাজ করে, ইসলামী ব্যাংকও সে সব কাজ আঞ্জাম দেয়। তবে দর্শন, মূলনীতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নিয়ম-পদ্ধতি ও নীতির দিক থেকে পুঁজিবাদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যাংকের প্রধান পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে সুদ। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় লেনদেন সুদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে সুদমুক্ত ব্যাংক মানেই ইসলামী ব্যাংক নয়। ইসলামী ব্যাংককে সুদ পরিহার করার সাথে সাথে এর যাবতীয় লেনদেন, কাজ-কর্ম এবং নিয়ম-পদ্ধতির সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালা ও বিধি-বিধান অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হয়। ইসলামের বাণিজ্যিক নীতিমালা, আইন-কানুন ও বিধি-বিধান থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স সংক্রান্ত পদ্ধতি এবং বিধি-বিধান উৎসারিত। ওলামায়ে কিরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এসব নীতি, বিধান ও পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন এবং প্রত্যেক ইসলামী ব্যাংক শরীয়া বোর্ডের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে এসবের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করে। ইসলামী ব্যাংক মূলতঃ ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ব্যাংকিং কারবার প্রতিষ্ঠান।

ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস হচ্ছে ঃ

১. পরিশোধিত মূলধন;
২. সংরক্ষিত তহবিল;
৩. অন্যান্য সঞ্চিতি ও অবন্টিত মুনাফা;
৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ;
৫. অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ;
৬. ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ;
৭. জনগণের গচ্ছিত আমানত; এবং
৮. যাকাত।

১. পরিশোধিত মূলধন

এ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তবে এসব ব্যাংকের অনেকগুলোতেই সরকার এবং সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশের কোম্পানী আইনের অধীনে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী

www.pathagar.com

হিসেবে এসব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত। বেশ ক'টি ব্যাংকে দেশের ভিতর ও দেশের বাইরের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান মূলধন যোগান দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশ সরকার এই ব্যাংকের ৫% শেয়ারের মালিক; দেশের ভেতর থেকে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বাইরে থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ কয়েকটি বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশী সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এই ব্যাংকের মূলধনে অংশ নিয়েছে। অনুরূপভাবে মিশর, সুদান, সেনেগাল ও তুরস্কেও দেশী-বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইডিবিও বেশ ক'টি ব্যাংকের মূলধনে অংশ নিয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং কোম্পানী শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এর মূলধন সংগ্রহ করে। ইসলামী ব্যাংকিং কোম্পানী স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয় এবং শেয়ারের জন্য বিনিময়যোগ্য (Negotiable) সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে। ইসলামী শরীয়তের মুশারাকা (অংশীদারী) নীতিমালার অধীনে এসব শেয়ার ইস্যু করা হয়। মুশারাকার বিধান অনুযায়ী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারগণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় অংশ নিতে পারেন। তাঁরা ভোট দিয়ে তাঁদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে এ অধিকার প্রয়োগ করেন। তাঁরা তাঁদের পুঁজির আনুপাতিক হারে ব্যাংকের লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামী ব্যাংকিং কোম্পানী প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্বক নতুন শেয়ার বিক্রি করে এর পরিশোধিত মূলধন বাড়াতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, যেহেতু ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূলতঃ একটি ইকুইটি ভিত্তিক ব্যবস্থা, সেজন্য ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার-ভিত্তি মজবুত ও ব্যাপক হওয়া জরুরী। এতে ব্যাংকে অর্থ-জমাকারীগণ অধিকতর নিরাপত্তা বোধ করবে এবং উৎসাহিত হবে; তাছাড়া সঞ্চয়কারীরা ব্যাংকের শেয়ারে বিনিয়োগের বেশী সুযোগ পাবে। এসব দিক লক্ষ্য করে ইসলামী ব্যাংকের ইকুইটি-ডিপোজিটের অনুপাত নির্ধারণ করা উচিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে এ হার স্থির করে দিতে পারে। বর্তমানে সব দেশেই ইসলামী ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত অনুপাতে ইকুইটি সংরক্ষণ করতে হয়। অবশ্য পরিশোধিত মূলধনের সাথে সংরক্ষিত তহবিল, অন্যান্য সঞ্চিতি ও অবন্টিত মুনাফাকেও ইকুইটি হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বর্তমান নির্দেশ অনুসারে ইসলামী ব্যাংকের জন্য মোট আমানতী দেনার শতকরা ৬ ভাগ ইকুইটি রাখা আবশ্যক।

২. সংরক্ষিত তহবিল

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধান অনুসারে ইসলামী ব্যাংককে প্রতি বছর এর কর-পূর্ব নীট মুনাফার একটি নির্ধারিত অংশ সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে জমা রাখতে হয়।

www.pathagar.com

এ অর্থকে ব্যাংকের মূলধন গণ্য করা হয়। ব্যাংকের এ সঞ্চিতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলধন–ভিত্তিকে মজবুত করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইচ্ছা করলে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে এ সঞ্চিতির হার পরিবর্তন করতে পারে এবং কোন ব্যাংকের সঞ্চিত তহবিলকে যথেষ্ট মনে করলে সে ব্যাংককে লিখিতভাবে উক্ত রূপ সঞ্চিতি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। উল্লেখ্য যে এক বছর পার হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর এরূপ তহবিলের উপর ইসলামী ব্যাংকে যাকাত পরিশোধ করতে হয়।

৩. অন্যান্য সঞ্চিতি ও অবন্টিত মুনাফা

মূলধন–ভিত্তিকে মজবুত করা এবং ভবিষ্যতের লোকসান বা অন্য যে কোন ধরনের আপদ মুকাবিলার লক্ষ্যে মুনাফা থেকে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে সঞ্চয় করে ইসলামী ব্যাংক বিশেষ সংরক্ষিত তহবিল গড়ে তুলতে পারে। এ ছাড়া ব্যাংক তার মুনাফা বন্টন না করে সম্পূর্ণ মুনাফা বা এর অংশ দ্বারাও সঞ্চিত তহবিল গড়তে পারে। তবে কর প্রদানের পরই কেবল অনুরূপ সঞ্চয় করা যায়। এসব সঞ্চিত তহবিলও ব্যাংকের মূলধন বলে পরিগণিত হয় এবং ব্যাংককে প্রতিবছর এর উপর যাকাত দিতে হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার বার্ষিক বিনিয়োগ–আয়ের ১০% সঞ্চয় করে 'লস অফসেটিং রিজার্ভ' নামে একটি তহবিল গঠন করেছে।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। ইসলামী ব্যাংক কখনো তারল্য সমস্যায় পড়লে তা মুকাবিলার জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সাময়িকভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী ব্যাংক এরূপ ঋণকে লাভ–ক্ষতিতে অংশীদারী জমা হিসেবে গণ্য করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নামে মুদারাবাহ হিসাব খুলে উক্ত হিসাবে ঋণের অর্থ জমা করে দেয়। ব্যাংক এ অর্থ কারবারে খাটায় এবং মুদারাবাহ হিসাবে যে হারে মুনাফা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সে হারে মুনাফা দেয়।

৫. অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ

দেশে–বিদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রয়োজনে অর্থ লেনদেন করতে পারে। ইসলামী শরীয়তে এরূপ লেনদেনে কোন বাধা নেই। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকের কাছ থেকেও আলাপ–আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে; উক্ত সুদী ব্যাংকও প্রয়োজনে সমপরিমাণ অর্থ একই মেয়াদের জন্য ইসলামী ব্যাংককে ধার দেয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশী–বিদেশী সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তবে এ ব্যাপারে কারো কারো অভিমত হচ্ছে, পূর্ব–সমঝোতার

www.pathagar.com

ভিত্তিতে ঋণের বিপরীতে আবার নির্ধারিত ঋণ সুবিধা নেয়া সুদের মধ্যে শামিল এবং এরূপ লেনদেন শরীয়তে অনুমোদিত নয়[১]। এ ব্যাপারে আরো চিন্তা–ভাবনা ও গবেষণা প্রয়োজন।

৬. ইসলামী অর্থায়ন-পত্র বিক্রয় (Islamic Financial Instrument)

ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে সুদী ঋণপত্র ও সিকিউরিটির পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে এর মাধ্যমে অর্থায়নের পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পাকিস্তানে 'পার্টিসিপেশন টার্ম সার্টিফিকেটস' (PTCS) এবং 'মুদারাবাহ সার্টিফিকেটস' জর্দানে 'মুকারাদা সার্টিফিকেটস' এবং মালয়েশিয়া, মিশর ও ইয়েমেনে 'গভর্ণমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট' চালু করা হয়েছে। এসব ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করে ইসলামী ব্যাংক এর তারল্য ঘাটতি মুকাবিলা অথবা কোন বিশেষ প্রকল্পের জন্য লাভ–লোকসানের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৭. জনগণের গচ্ছিত আমানত

ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের বৃহত্তর অংশ আসে গ্রাহকদের গচ্ছিত আমানত থেকে। ইসলামী ব্যাংক প্রধানত ওয়াদিয়াহ্ ও মুদারাবাহ্ ভিত্তিতে জনগণের অর্থ গচ্ছিত রাখে।

ওয়াদিয়াহ্ হচ্ছে নিরাপদে হেফাজত বা সংরক্ষণ করা। এটি একটি আমানত। কিন্তু আমানতকারীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যাংক এ অর্থ কারবারে ব্যবহার করে; এরূপ আমানতে আমানতকারীকে আমানত ফেরতের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং আমানতকারী যখনই ফেরত চায় তখনই ব্যাংক তার সাকুল্য অর্থ ফেরত দেয়। ব্যাংক এর উপর আমানতকারীকে কোন মুনাফা দেয় না। ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাবে এ নীতির ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করা হয়।

মুদারাবাহ ভিত্তিতে ব্যাংক এ শর্তে জমা গ্রহণ করে, অর্থ খাটিয়ে লাভ হলে জমাকারী পূর্ব–নির্ধারিত অনুপাতে লাভের অংশ পাবে; কিন্তু লোকসান হলে তা জমাকারীকে সম্পূর্ণ বহন করতে হবে।

ইসলামী ব্যাংক শরীয়তে বিধিবদ্ধ উক্ত পদ্ধতিতে বিপুল সঞ্চয় সমাবেশ করে এবং তা উৎপাদনশীল ও লাভজনক কারবারে খাটায়।

৮. যাকাত

ইসলামী ব্যাংক প্রতিবছর তার যাকাতযোগ্য সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করে এবং যাকাতের অর্থ দ্বারা পৃথক তহবিল গড়ে তোলে। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দুঃস্থ মানুষের পুনর্বাসন ও কল্যাণার্থে এ অর্থ ব্যয় করা হয়। ইসলামী ব্যাংককে যাকাতের অর্থের আয়–ব্যয়ের পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়। ব্যাংক এ অর্থ বিনিয়োগে খাটায় না। আল–কুরআনে নির্দেশিত যাকাত ব্যয়ের যে খাত রয়েছে, ব্যাংক এ অর্থ কেবল সে সব খাতেই ব্যয় করে থাকে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী

সুদী ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে অর্থ জমা নেয়া এবং বিনিয়োগকারীদের আর্থিক সহযোগিতা দান করা। কিন্তু পদ্ধতিগত দিক থেকে উভয় ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সুদী ব্যাংকে অর্থ আমানত রেখে সঞ্চয়কারীগণ পূর্ব-নির্ধারিত হারে সুদ পায়। অপরদিকে বিনিয়োগকারীগণ তাদের গৃহীত ঋণের উপর পূর্ব-নির্ধারিত হারে সুদ দেয়। এভাবে জমাকারী, ঋণ-গ্রহীতা ও ব্যাংক সকলেই সুদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক সুদ দেয় না এবং সুদ নেয় না; ব্যাংক এভাবে সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগ-গ্রহণকারী উভয়কেই সুদের লেনদেন থেকে মুক্ত করে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণের শর্তে সঞ্চয়কারীদের অর্থ জমা নেয়। অতঃপর ব্যাংক হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা তথা উৎপাদনশীল কারবারে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেয়ার শর্তে এ অর্থ বিনিয়োগ করে। এভাবে বিনিয়োগ থেকে ব্যাংক যে লাভ করে অথবা লোকসান দেয়, পূর্বশর্ত অনুসারে আমানতকারীদের তারই অংশ প্রদান করে। আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারী সকলেই সুদের ন্যায় পাপ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ লাভ করে এবং অর্থনীতি ও সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক জনগণের জন্যে কল্যাণমুখী আরো কিছু কাজ আঞ্জাম দেয়। এগুলো হচ্ছেঃ ১) সঞ্চয় সমাবেশ করা, ২) বিনিয়োগ করা, ৩) রেমিট্যান্স, ৪) কালেকশন, ৫) ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান, ৬) আভ্যন্তরীণ এলসি খোলা, ৭) লকার ভাড়া দান এবং ৮) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময় ইত্যাদি।

ডঃ এম. ওমর চাপরা লিখেছেন, "ইসলামী সঞ্চয় মজুদ করে রাখাকে ঘৃণা করে এবং সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল কাজে খাটানোর নির্দেশ দেয়।"[১] ইসলাম সঞ্চয়ের উপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছে, সঞ্চয়ের উৎপাদনশীল ব্যবহারকে তেমনি আবশ্যকীয় করে দিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সঞ্চয়কারীর পক্ষে তার সঞ্চয়ের উৎপাদনশীল ব্যবহার যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এসব সঞ্চয়কে একত্রিত না করে কোন বড় উৎপাদনে খাটানোও অসম্ভব।

ইসলামী ব্যাংক এ অভাব পূরণ করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় জনগণের অলস সঞ্চয় সমাবেশ করে। ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয় সমাবেশ করার পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ ।

www.pathagar.com

১. সঞ্চয় সমাবেশ

১। আল-ওয়দিয়াহ্ হিসাব (Al-Wadeah) ইসলামী ব্যাংক এবং এর আল-ওয়াদিয়াহ হিসাবে গ্রাহকদের অর্থ আমানত রাখে। সুদী ব্যাংকের চলতি হিসাবের সাথে এ হিসাবের কিছুটা মিল আছে।

সুদী ব্যাংক এ ধরনের আমানতের উপর জমাকারীদের কোন সুদ দেয় না। আমানতকারীগণ যে কোন সময়ে তাদের জমাকৃত অর্থের যে কোন অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ তুলে নিতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক শরীয়তে বর্ণিত আল-ওয়াদিয়াহ্ নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাবে আমানত গ্রহণ করে। আল-ওয়াদিয়াহ্ হচ্ছে ব্যবহারের অনুমতিসহ আমানত রাখা। ব্যাংক আমানতদার হিসেবে এ আমানতের সংরক্ষণ ও নিরাপদ হেফাজত করে। আমানতকারীগণ তাদের অর্থ ব্যাংকে আমানত রেখে নিরাপত্তা বোধ করে এবং লেনদেনের সুবিধা গ্রহণ করে। ব্যাংক আমানতের অর্থ চাহিবামাত্র আমানতকারীকে ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়।

এ ধরনের হিসাব খোলার সময়ই ব্যাংক আমানতকারীর কাছে থেকে আমানতি অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি নেয় এবং এ অর্থ খাটিয়ে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। এরূপ অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংক যদি কোন লোকসান দেয়, তাহলে সম্পূর্ণ লোকসানের দায়িত্ব ব্যাংকই বহন করে। আমানতকারীগণ এ লোকসানের দায়িত্ব নেয় না।

এ ধরনের আমানতে যেহেতু আমানতকারীগণ লোকসানের ঝুঁকি নেয় না, সেজন্য তারা মুনাফার কোন অংশও দাবী করতে পারে না। ব্যাংকও এ ধরনের আমানতের উপর আমানতকারীদের কোন মুনাফা দেয় না। এ অর্থ ব্যবহারের ঝুঁকি ব্যাংক একাই বহন করে; সুতরাং লাভ হলে তা সম্পূর্ণ ব্যাংকই পায়।

আমানতকারীদের চেক বই দেয়া হয়। তারা যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ বা সম্পূর্ণ অর্থ তুলে নিতে পারে এবং যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ অর্থ জমা দিতে পারে। ব্যাংক ইচ্ছা করলে এসব হিসাবের উপর আনুষঙ্গিক খরচ নিতে পারে।

এ ধরনের আমানত খুব স্বল্পকালীন এবং অনিশ্চিত। সেজন্য ব্যাংককে বিশেষ সতর্কতার সাথে এ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়।

২। সাধারণ মুদারাবাহ হিসাব ঃ সুদী ব্যাংকগুলো তাদের সঞ্চয়ী হিসাবে গ্রাহকের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে সুদ দেওয়ার শর্তে অর্থ জমা নেয়। এ জমাকে জমাকারীর কাছ থেকে গৃহীত ঋণ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ব্যাংক এর উপর দৈনিক প্রোডাক্ট হিসাব করে পূর্ব-নির্ধারিত হারে সুদ দেয়। সুতরাং সুদী ব্যবস্থায় সঞ্চয়ী আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আমানতকারীর সম্পর্ক হয় ঋণ-গ্রহীতার ও ঋণদাতার। সঞ্চয়ী আমানতের ক্ষেত্রে জমাকারীদের চেক বই দেয়া হয় এবং তারা সপ্তাহে বা মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ

www.pathagar.com

তুলে নিতে পারে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অর্থ তুলতে হলে ব্যাংককে পূর্বাহ্নে নোটিশ দিতে হয়। যেহেতু পূর্বাহ্নে নোটিশ না দিয়ে এ অর্থ উঠানো যায় না, সেজন্য এ অর্থ বিনিয়োগ করতে ব্যাংককে চলতি আমানতের ন্যায় ততটা সতর্ক থাকার প্রয়োজন হয় না।

ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবাহ্ হিসাব সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মুদারাবাহ্ হচ্ছে এক ধরনের কারবার–চুক্তি যেখানে এক পক্ষ অর্থের যোগান দেয় এবং আরেক পক্ষ শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করে কারবার পরিচালনা করে। কারবারে লাভ হলে পূর্ব–নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে উভয়ে তা ভাগ করে নেয়; কিন্তু লোকসান হলে পুঁজির মালিককে সম্পূর্ণ লোকসান বহন করতে হয়।

এরূপ কারবারে অর্থ যোগানদাতা কেবল হয় সাহিব আল–মাল, রাব্বুল মাল বা পুঁজির মালিক, আর কারবার পরিচালককে বলা হয় মুদারিব বা উদ্যোক্তা।

মুদারাবাহ্ হিসাবে ব্যাংক সাধারণ মুদারাবাহ্ চুক্তির ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে। এ হিসাবের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে না। ব্যাংক শরীয়ত–সম্মত যে কোন লাভজনক কারবারে এবং যে কোন জায়েয পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার শর্তে এ ধরনের আমানত গ্রহণ করে। এজন্য এ আমানতকে বলা হয় সাধারণ মুদারাবাহ্ আমানত। মুদারাবাহ্ আমানতের ক্ষেত্রে আমানতকারী হয় সাহিব আল–মাল আর ব্যাংক হয় মুদারিব। হিসাব খোলার সময়ে উভয়ের মধ্যে মুনাফা বন্টনের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। এতে বলা হয় যে এ অর্থ খাটিয়ে অর্জিত মুনাফার শতকরা ৫০, ৬০, ৭০ বা ৭৫ ইত্যাদি ভাগ সাহিব আল–মাল পাবে এবং বাকী অংশ পাবে ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংক নিজে সাহিব আল–মালের এই নির্ধারিত অংশ কমাতে পারে না; তবে ইচ্ছা করলে নিজের অংশ হ্রাস করে সাহিব আল–মালকে বেশী দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আমানতকারীর সম্পর্ক হয় অংশীদারিত্বের-সুদী ব্যাংকের ন্যায় ঋণ–গ্রহীতা–ঋণদাতার নয়।

ইসলামী ব্যাংক এর সাধারণ মুদারাবাহ্ হিসাবে জমাকৃত অর্থ কারবারে খাটানোর জন্য আমানত হিসাবে গ্রহণ করে এবং ব্যাংক নিজে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে এ অর্থ লাভজনক কারবারে খাটায়। এতে ব্যাংক যে মুনাফা পায়, পূর্ব–নির্ধারিত শর্ত অনুসারে সে মুনাফার অংশ মুদারাবাহ্ আমানতকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেয় এবং বাকী অংশ ব্যাংক নেয়। এ অর্থ খাটিয়ে ব্যাংক যদি লাভ না পায়, তাহলে আমানতকারীকে কোন লভ্যাংশ দেয়া হয় না এবং ব্যাংকও কিছুই পায় না। কিন্তু অর্থ খাটিয়ে যদি লোকসান হয়, তাহলে শরীয়ত অনুসারে আর্থিক লোকসানের সম্পূর্ণ অংশ মুদারাবাহ্ আমানতকারীদের মধ্যে তাদের জমাকৃত অর্থের আনুপাতিক হারে ভাগ করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে আমানতকারীদের দায়িত্ব তাদের জমাকৃত অর্থের সমান, এর বেশী দায়িত্ব তাদের উপর চাপানো যাবে না। তবে মুদারিব হিসেবে ব্যাংক বা এর কোন কর্মকর্তা–কর্মচারীর ত্রুটি,

www.pathagar.com

অবহেলা বা শর্ত ভঙ্গের কারণে লোকসান হলে সে লোকসানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্যাংককেই বহন করতে হবে।

সুতরাং মুদারাবাহ আমানতের উপর ব্যাংক যে সুবিধা দেয়, তা হচ্ছে লাভ-ক্ষতির অংশ এবং তা অনির্ধারিত, অনিশ্চিত ও ঝুঁকিবহুল। মুদারাবাহ আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাংক আমানতের অর্থ ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা দেয় না; তবে লাভ-ক্ষতির অংশ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমানতকারী যদি লাভ পায়, সে লাভসহ অথবা লোকসান হলে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ তুলে নিতে পারে।

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য উল্লেখ করা দরকার যে মুদারাবাহ আমানতকারীগণ লাভ-ক্ষতিতে অংশীদার হলেও তারা শেয়ারহোল্ডারদের ন্যায় ব্যাংকের সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির অংশীদার নন; বরং মুদারাবাহ আমানতে জমাকৃত অর্থ খাটিয়ে ব্যাংক যে লাভ পায় বা লোকসান দেয়, মুদারাবাহ আমানতকারীগণ কেবল সেই লাভের অংশ পায় এবং কেবল সেই ক্ষতিরই সম্পূর্ণ অংশ বহন করে।

লোকসানের মাধ্যমে মুদারাবাহ আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ যাতে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় বা নিঃশেষ হয়ে না যায়, সেজন্য বিশেষজ্ঞগণ ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠন করার পরামর্শ দিয়েছেন।[২] ব্যাংক এর মুদারাবাহ আমানতের অর্থ খাটিয়ে যখন মুনাফা অর্জন করবে, তখন সেই মুনাফার একটা নির্ধারিত অংশ (৫% বা ১০%) পৃথক করে ক্ষতিপূরণ তহবিলে সংরক্ষণ করতে পারে এবং কখনো লোকসান হলে সেই তহবিল থেকে মুদারাবাহ জমাকারীদের ক্ষতিপূরণ করতে পারে।

ব্যাংক এর অন্যান্য সূত্র , যেমন-চলতি হিসাব, শেয়ারহোল্ডার, ঋণ ইত্যাদি উৎস থেকে গৃহীত বা প্রাপ্ত অর্থ খাটিয়ে যে মুনাফা করে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজের বিনিময়ে সেবা-মূল্য, কমিশন ইত্যাদি বাবদ যে আয় পায়, তার অংশ মুদারাবাহ জমাকারীগণ পায় না; অপরদিকে এসব অর্থ খাটিয়ে কোন লোকসান হলে সে লোকসানের কোন অংশও মুদারাবাহ জমাকারীগণ বহন করে না। তাছাড়া এসব কাজে ব্যাংকের যে খরচ হয়, সে খরচও মুদারাবাহ হিসাবধারীগণ বহন করে না।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে মুদারাবাহ হিসাবে জমাকৃত অর্থ খাটানোর জন্য ব্যয়িত শ্রম ও সময়ের জন্য ব্যাংক কোন নির্দিষ্ট মজুরী, পারিশ্রমিক বা ভাতা নিতে পারে না; তবে কারবারের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য খরচ এ অর্থ থেকে বহন করতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন-এক মাস, তিন মাস, ছয় মাস, এক বছরে মুদারাবাহ আমানতকারীদের প্রত্যেকের হিসাবে রক্ষিত গড় অর্থের ভিত্তিতে জমাকারীদের মধ্যে মুনাফার অংশ বন্টন করে থাকে।

সাধারণ মুদারাবাহ আমানতকারীদের পাশ বই এবং চেক বই দেয়া হয়। যেহেতু

www.pathagar.com

ব্যাংক এই আমানতের উপর লাভ দেয়, সেজন্য হিসাব খোলার সময়ে চুক্তিপত্রে ব্যাংক এই হিসাবে জমাকৃত অর্থের উপর কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত আরোপ করে থাকে। এসব শর্তের মধ্যে সাধারণতঃ সপ্তাহে একবারের অধিক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী অর্থ তুলে নিতে না পারা, নির্ধারিত পরিমাণের অধিক অর্থ তুলতে হলে নির্দিষ্ট সময় পূর্বে নোটিশ দেয়া এবং নির্দিষ্ট একটা ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ সব সময়ে হিসাবে জমা রাখা ইত্যাদি শর্ত থাকতে পারে। কোন আমানতকারী কখনো এসব শর্ত ভঙ্গ করলে ব্যাংক এ হিসাবের উপর সেই সময়ের জন্য মুনাফা নাও দিতে পারে। বরং ব্যাংক শর্ত-ভঙ্গকারী আমানতকারীর কাছ থেকে হিসাবের আনুষঙ্গিক খরচ কেটে নিতে পারে। অবশ্য এসব শর্ত চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকলেই কেবল এরূপ হতে পারে।

মুদারাবাহ জমাকারীগণ শরীয়তের শর্ত মোতাবেক ব্যাংকের কারবারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং ব্যাংক পরিচালনায় অংশ নেয়ার অধিকারও তাদের থাকে না।

৩। মেয়াদী মুদারাবাহ হিসাবঃ সুদী ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে বিভিন্ন মেয়াদী আমানত (Term Deposit) গ্রহণ করে। এসব আমানত সাধারণতঃ ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস, ১ বছর, ২ বছর, ৩ বছর ইত্যাদি মেয়াদের জন্য হয়ে থাকে। এসব জমার উপর ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ দিয়ে থাকে। মেয়াদ যত দীর্ঘ হয় সুদের হার তত বেশী এবং মেয়াদ যত কম হয় সুদের হারও তত কম ধরা হয়। তবে সঞ্চয়ী আমানতের উপর দেয় সুদের হারের চেয়ে মেয়াদী আমানতে সুদের হার বেশী ধরা হয়। আমানতকারীগণ মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে তাদের অর্থ তুলে নিতে পারে না। তবে মেয়াদ পূর্ণ হবার পর নির্ধারিত সুদসহ সাকুল্য অর্থ উঠিয়ে নিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে নতুন চুক্তির অধীনে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আবার জমা রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের আমানতের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ী আমানতের ন্যায় ব্যাংক ও আমানতকারীর সম্পর্ক হয় ঋণ-গ্রহীতা-ঋণদাতার; ব্যাংক নির্ধারিত সুদের হারে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহণ করে এবং আমানতকারী ঋণ দেয়। এসব আমানতের ক্ষেত্রে আমানতকারীদের চেক বই দেয়া হয় না; তবে মেয়াদী আমানত সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

ইসলামী ব্যাংকও এর গ্রাহকদের কাছ থেকে মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে। তবে প্রকৃতিগত দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকের মেয়াদী আমানত সুদী ব্যাংকের মেয়াদী আমানত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী ব্যাংক যখন কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মুদারাবাহ চুক্তির ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে তখন সে আমানত হয় মেয়াদী মুদারাবাহ আমানত। সাধারণতঃ ৩ মাস থেকে শুরু করে ৩ বছর বা তদূর্ধ্ব যে কোন নির্ধারিত মেয়াদের জন্য এরূপ আমানতগ্রহণ করা হয়। অতঃপর চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে মুদারিব হিসেবে

www.pathagar.com

এ অর্থ খাটিয়ে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করে, তার নির্ধারিত অংশ আমানতকারীদেরকে দেয় এবং বাকী অংশ ব্যাংক নেয়। কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদে এ অর্থ খাটিয়ে যদি ব্যাংকের লোকসান হয়, তাহলে আমানতকারীগণ তাদের হিসাবে রক্ষিত অর্থের আনুপাতিক হারে সে লোকসান বহন করে। নির্ধারিত মেয়াদশেষে চুক্তি সমাপ্ত হয়ে যায় এবং আমানতকারী প্রাপ্ত লাভসহ অথবা লোকসান হলে তার আনুপাতিক অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ তুলে নেয় এবং ইচ্ছা করলে নতুন চুক্তির অধীনে আবার জমা রাখতে পারে। মুদারাবাহ মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে আমানতকারীকে চেক বই দেয়া হয় না, তবে মেয়াদী মুদারাবাহ আমানত সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আমানতকারী তার অর্থ তুলে নিতে পারে না।

মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থ কত সময়ের জন্য ব্যাংকের কাছে থাকবে তা জানা থাকে বলে ব্যাংক পরিকল্পনা মুতাবেক এ অর্থ নির্ধারিত সময়ের জন্য খাটানোর সুযোগ পায়। সেজন্য সাধারণ মুদারাবাহ আমানত অপেক্ষা মেয়াদী আমানতের উপর ব্যাংক অধিক হারে মুনাফা দেয় এবং মেয়াদ যত দীর্ঘ হয় মুনাফার হারও তত বেশী হয়। অর্জিত মুনাফা বন্টন করার সময় ব্যাংক ওয়েটেজ (Weightage) পদ্ধতি প্রয়োগ করে মুনাফার হার স্থির করে যাতে সাধারণ মুদারাবাহ হিসাবে রক্ষিত অর্থের তুলনায় ৩ মাসের মেয়াদী আমানত বেশী হারে, ৬ মাসের মেয়াদী আমানত তার চেয়ে বেশী হারে এবং এভাবে দীর্ঘতর মেয়াদের আমানত যেন অধিকতর হারে মুনাফা পায়।

মেয়াদী মুদারাবাহ হিসাব এবং সাধারণ মুদারাবাহ হিসাবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে সাধারণ মুদারাবাহ হিসাবের কোন নির্ধারিত মেয়াদ থাকে না, আর মেয়াদী মুদারাবাহ আমানতের মেয়াদ নির্ধারিত থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এ দু'টির আর তেমন কোন পার্থক্য নেই।

৪। **বিশেষ মুদারাবাহ আমানত ঃ** ইসলামী ব্যাংক যখন এর নির্দিষ্ট কোন কারবার, বিশেষ কোন খাতে বিনিয়োগ অথবা বিশেষ কোন প্রকল্পে খাটানোর চুক্তিতে এর গ্রাহকদের কাছ থেকে মুদারাবাহ ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করেন, তখন সে আমানতকে বলা হয় বিশেষ মুদারাবাহ আমানত। এরূপ ক্ষেত্রে আমানত গ্রহণকালে আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি করা হয় যে ব্যাংক এ অর্থ কোন নির্ধারিত কারবার, যেমন–সারের ব্যবসা, লবণের ব্যবসা ইত্যাদি, অথবা বিশেষ কোন খাত, যেমন–শিল্প খাত, বস্ত্র খাত, আমদানী–রপ্তানী খাত ইত্যাদি অথবা ব্যাংকের বিশেষ কোন প্রকল্প, যেমন–রিয়েল এস্টেট, জাহাজ নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে খাটাবে এবং এই কারবার, খাত বা প্রকল্প থেকে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে, তার নির্ধারিত অংশ আমানতকারীকে দেওয়া হবে এবং বাকী অংশ ব্যাংক নিবে। অতঃপর ব্যাংক এ অর্থ শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট কারবার, খাত বা প্রকল্পে খাটায় এবং সেই কারবার, খাত বা প্রকল্প থেকে যে লাভ পায়, কেবল সেই

www.pathagar.com

লাভের নির্ধারিত অংশ বিশেষ মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। কিন্তু সেই বিশেষ কারবার, খাত বা প্রকল্পে যদি লোকসান হয়, তাহলে বিশেষ মুদারাবাহ আমানতকারীগণ তাদের জমাকৃত অর্থের অনুপাতে সেই লোকসান বহন করে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যয়িত শ্রম ও সময় বৃথা যায়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে।

ধরা যাক, ১০ জন আমানতকারী প্রত্যেকে ১ লাখ করে মোট ১০ লাখ টাকা ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত একটি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে খাটানোর শর্তে বিশেষ মুদারাবাহ আমানত হিসেবে জমা রাখলো এবং চুক্তি করল যে সেই প্রকল্পে যে লাভ হবে তার শতকরা ৬০ ভাগ তারা পাবে এবং বাকী ৪০ ভাগ পাবে ব্যাংক। অতঃপর ধরা যাক, ব্যাংক এই ১০ লাখ টাকা সেই বিশেষ প্রকল্পে খাটালো এবং সেখান থেকে ৫ লাখ টাকা লাভ অর্জন করলো। ব্যাংক এই ৫ লাখ টাকার ৬০% অর্থাৎ ৩ লাখ টাকা উক্ত ১০ জন আমানতকারীর মধ্যে ভাগ করে দেবে এবং বাকী ২ লাখ টাকা নিজে নিবে। অপর দিকে যদি দেখা যায় যে উক্ত প্রকল্পে ১ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে, তাহলে উক্ত আমানতকারীগণ তাদের অর্থের আনুপাতিক হারে অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমানত থেকে ১০ হাজার টাকা করে লোকসান বহন করবে।

বিশেষ মুদারাবাহ আমানতের বেলায় আমানতকারীগণ যে কারবার, খাত বা প্রকল্পে খাটানোর জন্য আমানত রাখে, তারা কেবল সেই কারবার, খাত বা প্রকল্পের লাভ–ক্ষতির অংশীদার হয়। ব্যাংকের সামগ্রিক লাভ–ক্ষতি বা অন্যান্য মুদারাবাহ কারবারের লাভ–ক্ষতিতে তাদের কোন দায়–দায়িত্ব থাকে না।

সাধারণ মুদারাবাহ আমানতে কারবার বা সময়ের শর্ত থাকে না; ব্যাংক এর যে কোন কারবারে এ অর্থ খাটাতে পারে এবং আমানতকারী পূর্বাহ্নে নোটিশ দিয়ে যে কোন সময় মুনাফাসহ বা লোকসান বাদ দিয়ে এ অর্থ তুলে নিতে পারে। মেয়াদী মুদারাবাহ আমানতের বেলায় কারবারের শর্ত থাকে না; কিন্তু মেয়াদ নির্ধারিত থাকে। ব্যাংক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে যে কোন কারবারে এ অর্থ খাটাতে পারে। মেয়াদ শেষ হলে মুনাফাসহ বা ক্ষতি বাদ দিয়ে এ অর্থ ফেরত দিতে হয়। আর বিশেষ মুদারাবাহ আমানতের ক্ষেত্রে মেয়াদের শর্ত থাকে না, তবে কারবারের শর্ত করা হয়। কারবার শেষ হলে লাভসহ অথবা লোকসান বাদে বাকী অর্থ ফেরত দিতে হয়।

৫। বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ হিসাব ঃ বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ চুক্তিতে বিশেষ কারবার, প্রকল্প, ব্যবসা বা শিল্প নির্দিষ্ট করার সাথে সাথে কারবারের মেয়াদও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। মুদারিব নির্দিষ্ট কারবারে মুদারাবাহ অর্থ বিনিয়োগ করে এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কারবার পরিচালনা করে। মেয়াদ ও কারবার শেষ হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

২. বিনিয়োগ

সঞ্চয় সমাবেশ করার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হচ্ছে সঞ্চিত অর্থ লাভজনক কারবারে বিনিয়োগ করা। ইসলামী ব্যাংক এর গ্রাহকদের কাছ থেকে আল-ওয়াদিয়াহ হিসাব, সাধারণ মুদারাবাহ হিসাব, মেয়াদী মুদারাবাহ হিসাব এবং বিশেষ মুদারাবাহ হিসাবে বিপুল পরিমাণ আমানত গ্রহণ করে; এছাড়া শেয়ারহোল্ডারদের পরিশোধিত মূলধনও ব্যাংকের কাছে থাকে। ব্যাংক এসব অর্থ প্রধানতঃ লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারির শর্তে গ্রহণ করে এবং লাভজনক কারবারে খাটায়। এ ব্যাপারে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইসলামী ব্যাংক সুদ দিয়ে ঋণ নেয় না এবং সুদ নিয়ে ঋণ দেয় না; ইসলামী ব্যাংক এর প্রাপ্ত অর্থ শরীয়তসম্মত কারবারে শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংক যে লাভ অর্জন করে, সেই লাভই নির্ধারিত শর্ত অনুসারে ব্যাংক এবং আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো।

ক) মুদারাবাহ বিনিয়োগ ঃ মুদারাবাহ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের আসল বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক মুদারাবাহ ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে এবং মুদারাবাহ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। আমানত গ্রহণকালে আমানতকারী সাহিব আল-মাল আর ব্যাংক হয় মুদারিব; বিনিয়োগ-কালে ব্যাংক হয় সাহিব আল-মাল এবং গ্রাহক বা বিনিয়োগকারী হয় মুদারিব। এজন্য ইসলামী ব্যাংককে দ্বিস্তর (Two tier) বিশিষ্ট মুদারাবাহ ব্যাংকও বলা হয়।[৩] মুদারাবাহ বিনিয়োগে সাহিব আল-মাল হিসেবে ব্যাংক অর্থ যোগান দেয় এবং বিনিয়োগকারী গ্রাহক তার শ্রম ও সময় ব্যয় করে কারবার পরিচালনা করে। বিনিয়োগের পূর্বেই উভয়ের মধ্যে লাভ বন্টনের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। কারবারে লাভ হলে সেই নির্ধারিত অনুপাতে উভয়ের মধ্যে তা বন্টন করা হয়। কিন্তু কারবারে লোকসান হলে সে লোকসানের সাকুল্য অংশ সাহিব আল-মাল হিসেবে ব্যাংকই বহন করে। তবে মুদারিব বা কারবার পরিচালকের কোন প্রকার ইচ্ছাকৃত গাফেলতি, ত্রুটি বা চুক্তিভঙ্গের জন্য লোকসান হলে তার দায়িত্ব ব্যাংক গ্রহণ করে না।[৪] শরীয়তের শর্ত অনুসারে ব্যাংক মুদারিবের কারবারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ অথবা কারবার পরিচালনায় অংশ নিতে পারে না। তবে চুক্তির শর্ত অনুসারে ব্যাংকের অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদারক করতে পারে।[৫] মুদারিব কারবারের মুনাফার নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক বা ভাতা নিতে পারে না[৬] এবং নিজস্ব কোন খরচও কারবার থেকে বহন করতে পারে না। তবে কারবারের সাথে সম্পৃক্ত স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ব্যয় কারবার থেকে নিতে পারে ।[৭]

মুদারাবাহ আমানতের ন্যায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সাধারণ মুদারাবাহ বিনিয়োগ, মেয়াদী মুদারাবাহ বিনিয়োগ এবং বিশেষ মুদারাবাহ বিনিয়োগ করা যেতে পারে। সাধারণ

www.pathagar.com

মুদারাবাহ্ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিতে কারবারের ধরন, প্রকৃতি, মেয়াদ ইত্যাদি বিষয়ে কোন শর্ত থাকে না। মুদারিব স্বাধীনভাবে যে কোন কারবারে এবং যে কোন মেয়াদের জন্য এ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে।

মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিতে কারবারের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়; নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলেই চুক্তি শেষ হয় এবং লাভ-লোকসান হিসাব ও বন্টন চূড়ান্ত করে কারবার সমাপ্ত করতে হয়। মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত সময়ে, যেমন-৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর পরপর হিসাব করে লাভ-লোকসান বন্টন করা যেতে পারে; তবে চূড়ান্ত হিসাব মেয়াদ পূর্ণ হলেই করতে হয়। বিশেষ মুদারাবাহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে কোন বিশেষ কারবার, বিশেষ খাত বা বিশেষ প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার চুক্তি করা হয়। মুদারিব চুক্তির শর্ত অনুসারে সেই বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং সে বিশেষ কারবার বা প্রকল্প সমাপ্ত হলে কারবারের লাভ-লোকসান হিসাব ও বন্টন চূড়ান্ত করে কারবার শেষ করতে হয়। অবশ্য চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বেও ৩ মাস, ৬ মাস বা ১ বছর পর পর হিসাব করে লাভ-লোকসান বন্টন করা যেতে পারে। তবে তা অগ্রিম হিসেবে গণ্য হবে এবং চূড়ান্ত হিসাবের পর এরূপ অগ্রিম সমন্বয় করতে হবে।

খ) মুশারাকাহ বিনিয়োগ ঃ মুশারাকাহ্ বা শিরকত হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতি। শিরক থেকে মুশারাকাহ্ বা শিরকতের উদ্ভব। এর অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। মুশারাকাহ্ হচ্ছে এমন অংশীদারী কারবার যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাভ করার উদ্দেশ্যে কারবার করার জন্য পুঁজি যোগান দেয়, কারবার পরিচালনা করে এবং কারবারের লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেয়। কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়; আর লোকসান হলে প্রত্যেক অংশীদার তার পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করে।

মুশারাকাহ্ কারবারে গ্রাহক এবং ব্যাংক উভয়েই কারবারে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেয়; মোট পুঁজির একটা অংশ গ্রাহক দেয় এবং অপর অংশ দেয় ব্যাংক। এখানে মোট পুঁজির কত অংশ কে দেবে তার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। উভয়ের পুঁজি সমান সমান হতে পারে অথবা কম-বেশীও হতে পারে। শিরকত কারবার পরিচালনায় সকল অংশীদার অর্থাৎ ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েই কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং উভয় পক্ষ একে অপরের প্রতিনিধি ও ট্রাস্টী হিসেবে কাজ করে। কারবারে লাভ হলে পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে তা উভয়ে ভাগ করে নেয় এবং লোকসান হলে উভয় পক্ষ নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করে। কারবারের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য খরচ কারবার থেকে বহন করা হয় এবং কেবল নীট লাভ বা নীট লোকসান অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

মুদারাবাহ্ বিনিয়োগের মত এ ক্ষেত্রেও ব্যাংক সাধারণ মুশারাকাহ্, মেয়াদ ভিত্তিক মুশারাকাহ বা বিশেষ কারবার ভিত্তিক মুশারাকাহ বিনিয়োগ করতে পারে। এ ছাড়াও

www.pathagar.com

শরীয়তে বিভিন্ন ধরনের মুশারাকাহর কথা বলা হয়েছে। সে বিষয়ে পরে আলোকপাত করা হবে। মুশারাকাহ বিনিয়োগে কারবারের ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় ইসলামী ব্যাংকের অংশ নেয়ার প্রশ্ন এসে যায়; কিন্তু ব্যাংক বিপুল সংখ্যক কারবারে বিনিয়োগ করলে, তার সবগুলোতে প্রতিনিধি প্রেরণ করার মত পর্যাপ্ত জনবল ও দক্ষতা ব্যাংকের নাও থাকতে পারে। সেজন্য ইসলামী ব্যাংককে সীমিত আকারে মুশারাকাহ কারবারে বিনিয়োগ করতে হয়।[৮]

গ) শেয়ার বিনিয়োগ ঃ ইসলামী ব্যাংকের তৃতীয় প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে গঠিত যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন বা কোম্পানীর স্টক এবং শেয়ারে বিনিয়োগ করা। ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগেও এ ধরনের যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী গঠন এবং এর শেয়ার ক্রয় করতে পারে। বস্তুতঃ সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত বর্তমান ব্যবসা–বাণিজ্যের জগতে এ ধরনের বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকের জন্য একটি উত্তম বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। সুদী ব্যাংকগুলো তাদের পুঁজির এক বিরাট অংশ সুদ ভিত্তিক সরকারী সিকিউরিটি অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সুদ ভিত্তিক বন্ড বা ডিবেঞ্চার ক্রয়ে বিনিয়োগ করে থাকে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে এসব সুদ ভিত্তিক সিকিউরিটি, বন্ড বা ডিবেঞ্চারে অর্থ খাটানো সম্ভব নয়। সেজন্য সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপরিচালিত এবং উচ্চ ডিভিডেন্ড দিতে সক্ষম সরকারী বা বেসরকারী কারবার প্রতিষ্ঠান বা যৌথ মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে ইসলামী ব্যাংক এর অর্থ বিনিয়োগ করে উচ্চহারে লভ্যাংশ অর্জন করতে পারে। দেশে শেয়ার বাজার যদি সুসংগঠিত এবং যথার্থভাবে পরিচালিত হয়, তাহলে ইসলামী ব্যাংক যে কোন সময়ে ক্রীত শেয়ার এবং বন্ড বিক্রি করে নগদ অর্থ পেতে পারে। অন্যান্য বিনিয়োগ ক্ষেত্রে এ সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। তবে যে সব কারবার প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত এবং যাদের কারবার শরীয়ত নির্ধারিত পন্থা–পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, সে সব কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও স্টক ক্রয় করা ইসলামী ব্যাংকের জন্য বৈধ হতে পারে না। ইসলামী ব্যাংককে এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

ইসলামী ব্যাংক কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করলে সেই কোম্পানীর পরিচালনায় অংশ নিতে পারে, পরিচালনা পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে অথবা নির্বাচনে ভোট দিতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইসলামী ব্যাংকের আসল বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ। কিন্তু উপযুক্ত আইন–কাঠামোর অভাব, কর ব্যবস্থার ত্রুটি, যথাযথ হিসাবপত্র সংরক্ষণের ত্রুটি এবং সর্বোপরি ইসলামী ব্যাংককে অনৈসলামী পরিবেশে সুদী ব্যবস্থার পাশাপাশি কাজ করতে হচ্ছে বলে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঘ) সরাসরি বিনিয়োগ ঃ ইসলামী ব্যাংক দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পক্ষের সহায়তা ছাড়াই সরাসরি নিজেই ব্যবসা–বাণিজ্য, শিল্প–কারখানা, কৃষি ইত্যাদিতে অর্থ বিনিয়োগ

www.pathagar.com

করতে পারে। এক্ষেত্রে স্কীম তৈরী থেকে আরম্ভ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ ব্যাংক নিজেই আঞ্জাম দেয়। প্রকল্পের মূলধন ব্যাংকই যোগায় এবং এর মালিকানা ব্যাংকের হাতেই থাকে। এরূপ কারবারে লাভ হলে তার সবটাই ব্যাংক পায়, আর লোকসান হলে তারও সম্পূর্ণটা ব্যাংকই বহন করে। এই পদ্ধতির অধীনে ব্যাংক সরাসরি বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে লাভের ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সব ক'টি ইসলামী ব্যাংকেরই এ ধরনের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে।

ঙ) বাই-মোয়াজ্জাল ঃ বিক্রয় যখন বাকীতে করা হয় তখনই তা হয় বাই-মোয়াজ্জাল। 'আজল' অর্থ হচ্ছে মুলতবী রাখা, ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করা। সুতরাং ভবিষ্যতের নির্ধারিত কোন সময়ে এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করাকে বাই-মোয়াজ্জাল পদ্ধতি বলা হয়।[৯] নগদ বিক্রয়-কালে পণ্যের যে দাম নেয়া হয়, বাই-মোয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রয়-কালে তার চেয়ে কম দামে অথবা বেশী দামে পণ্য বিক্রয় করা যেতে পারে।[১০] ইসলামী ব্যাংকের কোন গ্রাহক যদি ব্যাংকের কাছ থেকে কোন বিশেষ পণ্য ক্রয় করতে চায়, কিন্তু উক্ত পণ্যের দাম নগদ পরিশোধ না করে ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট তারিখে এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধ করার প্রস্তাব দেয়, তাহলে ব্যাংক বাজার থেকে উক্ত পণ্য ক্রয় করে এবং পরস্পরের সম্মতিক্রমে মূল্য নির্ধারণ করে নির্ধারিত তারিখে বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে গ্রাহককে সরবরাহ দেয়। ব্যাংক যে দামে পণ্য ক্রয় করে, তার চেয়ে বেশী দামে বিক্রয় করে এবং এভাবে কম দামে ক্রয় এবং বেশী দামে বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে মুনাফা অর্জন করে। ক্রেতা পরবর্তী পর্যায়ে নির্ধারিত সময়ে এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে দাম পরিশোধ করে। বাই-মোয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ব্যাংকের ক্রয়-মূল্য এবং মুনাফা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করার দরকার হয় না, কেবল বিক্রয়-মূল্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট। অর্থাৎ বাই-মোয়াজ্জালের বেলায় ব্যাংক ক্রেতাকে পণ্যের ক্রয়-মূল্য জানাতে বাধ্য নয়।

চ) বাই-মুরাবাহা (Sale at cost plus profit) ঃ বাই-মুরাবাহা তিন রকম হতে পারে।[১১] সাধারণভাবে বাই-মুরাবাহা বলতে ক্রয়-মূল্যের উপর বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মুনাফা, মার্জিন বা মার্ক-আপ ধার্য করে বিক্রয় করাকে বুঝায়।[১২] এক্ষেত্রে ক্রেতার কাছ থেকে নগদ মূল্য গ্রহণ করে পণ্য সরবরাহ দেওয়া যেতে পারে অথবা ক্রেতাকে ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ে বা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগও দেওয়া যেতে পারে। বাই-মোয়াজ্জালের সাথে বাই-মুরাবাহার পার্থক্য হচ্ছে, বাই-মোয়াজ্জালে ক্রয়-মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে দাম নির্ধারণ করা হয়; এতে ক্রয়-মূল্য ও মুনাফা আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করা বা ক্রেতাকে জানানোর দরকার হয় না।[১৩] কিন্তু বাই-মুরাবাহাতে ক্রয়-মূল্য ও মুনাফা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হয় বা ক্রেতাকে জানাতে হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকার মুরাবাহাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'তাওলিয়াহ্'।[১৪] বিক্রেতা যদি তার নিজের জন্য কোন মুনাফা ধার্য না করে কেবল ক্রয়-মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, তাহলে সে বিক্রয়কে বলা হয় 'তাওলিয়াহ্'। অপরদিকে বিক্রেতা যদি ক্রয়-মূল্যের চেয়ে কম দামে বা নির্ধারিত লোকসানের ভিত্তিতে পণ্য বিক্রয় করে তাহলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে বলা হয়েছে 'ওয়াদিয়াহ্' (Wadeah)।[১৫]

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে উল্লেখিত তিন ধরনের বিক্রয়ই সম্পূর্ণ বৈধ।[১৬]

এই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে পণ্য ক্রয় করার পর ক্রয়-মূল্যের উপর উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রয় করে; গ্রাহক নগদ মূল্য পরিশোধ করে পণ্য সরবরাহ নিতে পারে অর্থাৎ কোন নির্ধারিত সময়ে এক সাথে অথবা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করতে পারে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে এ পদ্ধতি ব্যবহার করছে; অন্যান্য সকল ইসলামী ব্যাংকও এ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাজ করে থাকে।

বাই-মোয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতির শর্তাবলী

ফিকাহবিদগণ বাই-মোয়াজ্জাল ও বাই-মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় কেবল এই শর্তে অনুমোদন করেছেন যে,

১. ক্রেতার কাছে বিক্রি করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট মালামাল ব্যাংকের মালিকানা ও দখলে থাকতে হবে।[১৭] মাল ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত মালের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংককে বহন করতে হবে।[১৮] কারণ শরীয়তের বিধান অনুসারে যা নিজের মালিকানায় নেই তা বিক্রি করা যায় না এবং ঝুঁকি বহন না করে মুনাফা করাও বৈধ নয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যাংকের পক্ষে সব ধরনের মালামাল কিনে রাখা এবং পরে বিক্রি করা একটি অসম্ভব কাজ। এ অসুবিধা দূর করা এবং শরীয়তের বিধান পালন সহজ করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দিয়েছেন যে ব্যাংককে একই সাথে ক্রেতা ও বিক্রেতার সাথে মালের বিক্রয় এবং ক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।[১৯] বিক্রেতার সাথে ক্রয়-চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক পণ্যের মালিক হবে এবং ক্রেতার সাথে বিক্রয়-চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক মাল বিক্রয় করবে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ পরামর্শও দিয়েছেন, ব্যাংক যে বিক্রেতার কাছ থেকে মাল ক্রয় করবে সে বিক্রেতা ব্যাংকের কাছে বিক্রীত মাল পৃথক করে রাখবে এবং ব্যাংকের নির্দেশমত ব্যাংকের কোন প্রতিনিধি বা ব্যাংকের ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করবে। মোটকথা, মালের উপর ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মাল বিক্রয় করা হলে তা শরীয়তসম্মত হবে না। ডঃ এম. ওমর চাপরা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন, ব্যাংক যদি কেবল ক্রেতার সাথে একটিমাত্র বিক্রয়-চুক্তি করে, তা হলে তা বিধিসম্মত হবে না।[২০]

২. ব্যাংক যখনই মাল ক্রয় করবে এবং মালের উপর যখনই ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন থেকে গ্রাহকের (ক্রেতা) কাছে হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মালের ক্ষয়-ক্ষতি, হারিয়ে যাওয়া, চুরি যাওয়া, নষ্ট হওয়া ইত্যাদি যে কোন ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব ও ঝুঁকি ব্যাংককে বহন করতে হবে। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে ঝুঁকি ও কাজের ফল হচ্ছে মুনাফা। ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া মুনাফা নেয়ার এখতিয়ার নেই। এছাড়া চুক্তির শর্ত অনুসারে মাল সরবরাহের দায়িত্বও ব্যাংককে বহন করতে হবে।

৩. কোন কোন বিশেষজ্ঞ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে মাল ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত মাল নেয়া বা না নেয়ার ব্যাপারে ক্রেতাকে এখতিয়ার দেয়া উচিত। কিন্তু ডঃ হামুদ ও অন্যান্য লেখকগণ এরূপ এখতিয়ার দেয়া জরুরী নয় বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] তবে ক্রেতাকে যদি এরূপ এখতিয়ার দেয়া হয়, তাহলে মুরাবাহা ও বাই-মোয়াজ্জাল পদ্ধতির হালাল হওয়ার ব্যাপারে আর কোন দ্বিমত থাকে না, সর্বসম্মতভাবে একে জায়েজ বলা যাবে।

৪. ব্যাংক বিক্রেতা ও ক্রেতার সাথে যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করবে তাতে মালের নাম, ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ, মাল সরবরাহের সময়, স্থান ও ধরন, মূল্য ও মূল্য পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি, পরিবহণ খরচ, গুদাম ভাড়া, পাহারা ব্যয় কে বহন করবে ইত্যাদি সকল শর্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫. মনে রাখা দরকার যে বাই-মোয়াজ্জাল এবং মুরাবাহা পদ্ধতিতে একবার পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়ে গেলে তা আর পরিবর্তন করা যায় না। ক্রেতা যদি শর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করে, তবু অতিরিক্ত সময়ের জন্য লাভের হার বা দাম বৃদ্ধি করা যাবে না। কারণ মূল্য নির্ধারণ করে মালামাল সরবরাহের পর ক্রেতার কাছে যে অর্থ বাকী বা পাওনা থাকে তা আসলে কর্জ বা ঋণে রূপান্তরিত হয়। আর ঋণের উপর অতিরিক্ত কিছু ধার্য করলে বা ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তা সুদের মধ্যে গণ্য হয়।

৬. অন্যদিকে ক্রেতাকেও মনে রাখতে হবে যে ওয়াদা পালন এবং সময় মত ঋণ পরিশোধ করা তার জন্য ফরজ। সুতরাং এ ওয়াদা যাতে খেলাপ না হয় সেজন্য তাকে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। তাকে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াদা খেলাপ এবং ঋণ পরিশোধে গাফেলতিকে শরীয়তে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এজন্য তার শাস্তি হতে পারে।

৭. বাই-মোয়াজ্জাল এবং বাই-মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় অতি সহজ এবং এতে ঝুঁকিও খুব কম; অথচ মুনাফা অর্জনের দিক থেকে এ পদ্ধতি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। ক্রেতা যদি ওয়াদা খেলাপ না করে অথবা যদি দেউলিয়া হয়ে না যায়, তাহলে এরূপ কারবারে লোকসান হওয়ার তেমন কোন আশংকা নেই। তবে এ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার

www.pathagar.com

করা হলে এর মাধ্যমে ব্যাংকের লেনদেনে সুদ ঢুকে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। ব্যাংক বাস্তবে মাল ক্রয়–বিক্রয়ের ঝামেলায় না গিয়ে কেবল কাগজে–কলমে ক্রয়–বিক্রয় দেখিয়ে নির্ধারিত মুনাফা মার্জিনের ছদ্মাবরণে গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা দান করতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে সুদী লেনদেনে পর্যবসিত হবে।[২২] এছাড়া ক্রেতার আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে অতিরিক্ত মুনাফা আদায়ের আশংকাও এ পদ্ধতিতে রয়েছে, যা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব দিক চিন্তা করে বিশেষজ্ঞগণ বাই–মোয়াজ্জাল এবং মুরাবাহা পদ্ধতির সীমিত ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি একান্ত অপরিহার্য এবং নিরুপায় অবস্থা ব্যতীত এ পদ্ধতি ব্যবহার না করার ওপর তাঁরা জোর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামী ব্যাংক কোন্ কোন্ বিশেষ পণ্যে বা খাতে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবে এবং এতে লাভের হার কি হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা নির্ধারণ করে দিতে পারে।[২৩]

ছ) বাই-সালাম ঃ বাই–সালাম ইসলামী ব্যাংকের আর একটি শরীয়তসম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটি আসলে আগাম ক্রয়ের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন পণ্য ক্রয় করার শর্তে দাম নির্ধারণ করে বিক্রেতাকে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে দেয়; অতঃপর বিক্রেতা ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময় বা সময়ের মধ্যে শর্ত অনুসারে এ পণ্য ব্যাংকের কাছে সরবরাহ করে। সাধারণতঃ কৃষি এবং কুটির শিল্পের জন্য এ পদ্ধতি বেশী উপযোগী এবং সহায়ক। একদিকে ফসল বপন করার সময় কৃষকদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে না বলে তারা তাদের জমিজমা বন্ধক রেখে সুদী ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়; অপরদিকে ফসল তোলার সময় যোগান বেশী এবং দাম কম থাকে বলে তারা তাদের উৎপাদিত ফসল স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে কুটির শিল্পীরাও প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে সঠিকভাবে উৎপাদন কাজ চালাতে পারে না; আবার কোনক্রমে উৎপাদন করলেও যথার্থভাবে বাজারজাত করতে না পারায় দালাল–ফড়িয়াদের কাছে কম মূল্যে তাদের পণ্য বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাই–সালাম পদ্ধতিতে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করে কৃষক এবং কুটির শিল্পীদের উৎপাদিত পণ্য আগাম ক্রয়ের ভিত্তিতে ফসল বপন এবং উৎপাদনকালে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে পারে। পরবর্তীতে ফসল তোলার পর কৃষকগণ এবং উৎপাদনের পর কারিগরগণ ব্যাংকের কাছে তাদের উৎপাদিত ফসল ও পণ্য সরবরাহ করতে পারে এবং ব্যাংক এই ফসল ও পণ্য বিক্রি করে লাভ অর্জন করতে পারে। তবে উক্ত ক্রীত পণ্য বিক্রি করে যদি কোন লোকসান হয় অথবা ব্যাংকের মালিকানায় থাকা কালে যদি পণ্যের কোন ক্ষয়–ক্ষতি হয়, তাহলে তার সম্পূর্ণ দায়–দায়িত্ব ব্যাংককেই বহন করতে হবে।

www.pathagar.com

রপ্তানী ভিত্তিক শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাই-সালাম পদ্ধতিতে শিল্পের উৎপাদনযোগ্য পণ্য আগাম ক্রয় করতে পারে।

বাই-সালাম পদ্ধতির শর্তাবলী

১. বাই-সালাম পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

২. চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, গুণাগুণ, দাম, দাম পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি, পণ্য সরবরাহের সময়, স্থান ও ধরন, পরিবহন খরচ, গুদাম ভাড়া ইত্যাদি যাবতীয় শর্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩. চুক্তি স্বাক্ষরের পর অনতিবিলম্বে চুক্তিতে উল্লেখিত মালের ক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মালের সরবরাহ পর্যায়ক্রমেও গ্রহণ করা যাবে।

৪. ক্রেতা যে পরিমাণ পণ্যের দাম পরিশোধ করবে, বিক্রেতা যদি সে পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করতে না পারে, তাহলে যতটুকু মাল কম হবে বিক্রেতা ততটুকু মালের মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দিবে। আর বিক্রেতার সরবরাহকৃত মালের পরিমাণ যদি বেশী হয়, তাহলে ক্রেতাকে অতিরিক্ত মালের দাম পরিশোধ করতে হবে। বিনিয়োগ গ্রাহক যদি চুক্তিতে উল্লেখিত বিবরণ ও পরিমাণ অনুযায়ী মাল সময়মত সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি মালের যে অগ্রিম দাম গ্রহণ করেছেন তা ফেরত দিতে হবে।

৫. বাই-সালামে পণ্যের খরচ মূল্য এবং লাভ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা জরুরী নয়; বরং বিক্রেতা ও ক্রেতার পরস্পর সম্মতিতে বিক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করাই যথেষ্ট। তবে ক্রয়পদ্ধতি যদি মুরাবাহা বাই-সালাম হয়, তাহলে খরচ মূল্য ও মুনাফা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬. বাই-সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত পূরণ করতে হয়। মূলধন ও দ্রব্য- উভয় ক্ষেত্রেই এ শর্তগুলো পূরণ করা জরুরী।

মূলধনের ক্ষেত্রে শর্তগুলো হচ্ছে ঃ

১। মূলধনের প্রকৃতি (টাকা না ডলার ইত্যাদি) জানা।

২। মূলধনের পরিমাণ জানা।

৩। মজলিসে বা হাতে হাতে মূলধন হস্তান্তর করা।

দ্রব্য ক্ষেত্রে শর্তগুলো হচ্ছে ঃ

১। যথা সময়ে হস্তান্তরের জন্য পণ্যটি বিক্রেতার জিম্মায় অর্থ্যাৎ বিক্রেতার মালিকানা ও দখলে থাকতে হবে (কারণ পূর্ণ মালিকানার জন্য দখল শর্ত এবং কাংখিত পণ্য সরবরাহ করা বিক্রেতার একটি দায়িত্ব)।

www.pathagar.com

২। পণ্যের বিবরণঃ পণ্যের নাম, গুণাগুণ, দাম সরবরাহের স্থান প্রভৃতি জানা।

৩। আজল বা পণ্য সরবরাহের সময় জানা।

৭. বাই–মোয়াজ্জাল এবং বাই–মুরাবাহার ন্যায় বাই–সালামেও সুদ অনুপ্রবেশ এবং কম দাম দিয়ে উৎপাদনকারীদের ঠকানোর আশংকা রয়েছে। সেজন্য এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

৮. বাই–সালাম পদ্ধতি এমন এক পদ্ধতি যাতে শরীয়ার সাধারণ নীতির ব্যতিক্রমভাবে অনুপস্থিত বা উৎপাদিত হয়নি এমন পণ্য–সামগ্রী আগাম ক্রয়–বিক্রয় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে পণ্য–সামগ্রীর উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সে উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি চালু রয়েছে।

৯. মালের সরবরাহ গ্রহণের পর ব্যাংক মালের মালিকানা লাভ করবে এবং এ সময় হতে তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে মাল বিক্রয় বা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত মালের যাবতীয় দায়–দায়িত্ব ব্যাংককে বহন করতে হবে।

জ) ইজারা ঃ যে পদ্ধতিতে স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ–সম্পত্তি ক্রয় বা তৈরী করে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে অন্যকে ভোগ–ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, তাকে ইজারা বলা হয়। সম্পত্তির ইজারা-গ্রহীতা সম্পদ ব্যবহার করে উপকৃত হয় এবং এর বিনিময়ে সে ভাড়া দেয়। অপরপক্ষে ইজারাদাতা প্রাপ্ত ভাড়া হতে তার মূলধন ব্যয় উসূল করে এবং মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। ইজারা প্রথা সকল সমাজেই অতি পরিচিত এবং বহুল প্রচলিত একটি ব্যবস্থা। গাড়ী, যানবাহন, জমি, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি ধরনের যে সব সম্পত্তি, একবার–দুবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় না, তা সবই ভাড়ায় খাটানো যেতে পারে। শরীয়তে এরূপ ভাড়া দেয়ার অনুমতি রয়েছে। ইজারা সাধারণতঃ দুই প্রকার হতে পারেঃ (১) আর্থিক ইজারা এবং (২) ব্যবহারিক ইজারা।

১) আর্থিক ইজারাঃ অ–বাতিলযোগ্য ইজারা চুক্তিকে বলা হয় আর্থিক ইজারা।[২৪] এরূপ চুক্তির অধীনে ইসলামী ব্যাংক কোন স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ/সম্পত্তি ক্রয় করে দীর্ঘ বা মধ্যম মেয়াদের জন্য গ্রাহকের কাছে ইজারা দেয়। সম্পদের উপর ব্যাংকের মালিকানা বহাল থাকে। কিন্তু ইজারা–গ্রহীতা মাসিক বা বার্ষিক নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ–সাপেক্ষে উক্ত সম্পদ দখল এবং ভোগ–ব্যবহার করে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে ব্যাংক এর সম্পদ ফেরত নেয় অথবা নতুন চুক্তির অধীনে আবার ইজারা দিতে পারে। প্রাপ্ত ভাড়া থেকে ব্যাংক তার মূলধন ব্যয় উসুল করে লাভ করতে পারে; কিংবা প্রাপ্ত ভাড়া এবং ইজারার মেয়াদ শেষে উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ আয় মিলিয়ে ব্যাংকের লাভ হতে পারে। ইজারার মেয়াদ শেষে ইজারা–গ্রহীতা নিজেও উপযুক্ত দাম দিয়ে উক্ত সম্পদ ক্রয় করতে পারে।

২) ব্যবহারিক ইজারা ঃ ব্যবহারিক ইজারা সাধারণতঃ বাতিলযোগ্য এবং আর্থিক ইজারার তুলনায় স্বল্পমেয়াদের জন্য হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যবহারিক ইজারায়

www.pathagar.com

সম্পদের মালিক বা ইজারা-দাতাকেই মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয় বহন করতে হয়।[২৫]

যেহেতু ব্যবহারিক ইজারা স্বল্পমেয়াদের জন্য হয়, সেজন্য ব্যাংক ইজারার মেয়াদের মধ্যে সম্পদের ভাড়া থেকে এর সাকুল্য মূলধন ব্যয় উসুল করতে পারে না; মেয়াদ শেষে সম্পদ বিক্রি করে অবশিষ্ট মূলধন ব্যয় উসুল এবং মুনাফা অর্জন করতে হয়।

ইসলামী শরীয়তে আর্থিক মূলধনের উপর ভাড়া নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই, কারণ অর্থ ব্যবহার করলে আর অর্থ থাকে না-রূপান্তরিত বা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর ব্যবহারের ফলে যার অস্তিত্ব থাকে না, তা ভাড়া দেওয়া যায় না। কিন্তু শরীয়তে স্থায়ী সম্পদের ভাড়া অনুমোদন করা হয়েছে। কারণ প্রথমতঃ, স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহারের ফলে এর ক্ষয়-ক্ষতি হয়, কিন্তু নিঃশেষ বা রূপান্তরিত হয়ে যায় না; দ্বিতীয়তঃ, স্থায়ী সম্পদের বেলায় এর মালিক তার আর্থিক সম্পদের দ্বারা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করার মাধ্যমে সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ের ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে।

উপরে বর্ণিত স্বল্পমেয়াদী বাতিলযোগ্য ব্যবহারিক ইজারার ক্ষেত্রে ইজারাদাতাকেই সম্পদের সকল ঝুঁকি বহন করতে হয়। সুতরাং এ ধরনের ইজারা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অ-বাতিলযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ইজারার ক্ষেত্রেও ইজারাদাতা ইজারার মেয়াদ শেষে ফেরতপ্রাপ্ত সম্পদের বিক্রয়-মূল্যের ব্যাপারে ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। ইজারার দীর্ঘমেয়াদ শেষে ফেরতপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সম্পদটি সেকেলে (Obsolete) অথবা অতিরিক্ত ক্ষয়-ক্ষতির দরুন ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে ইজারাদাতা সম্পদটি বিক্রি করে তার আশানুরূপ দাম নাও পেতে পারে। এসব কারণে ইজারাদাতার উক্ত সম্পদের লাভ যেমন বেশী হতে পারে, তেমনি অতি নগণ্য লাভ অথবা লোকসান হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং ইজারাকে বৈধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[২৬]

তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন নির্ধারিত দামে ইজারা-গ্রহীতা উক্ত সম্পদ ক্রয় করবে চুক্তিপত্রে এরূপ কোন শর্ত থাকলে ইজারা--চুক্তি বৈধ হবে কিনা সে ব্যাপারে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে আরো চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

ঝ) ইজারা বিল-বাই (Hire-Purchase) ঃ ভাড়ায় ক্রয় ইজারা পদ্ধতির সাথে কিছুটা সংগতিশীল আর একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। এতে দুই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা যায়ঃ যার একটি হলো ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্ব পদ্ধতি এবং অপরটি হলো ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া পদ্ধতি।

(১) ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্ব পদ্ধতি (Hire-Purchase Shirkatul Meilk) ঃ এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক কোন আগ্রহী গ্রাহকের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ

www.pathagar.com

যোগান দিয়ে কোন প্রকল্প চালু করে অথবা স্থায়ী প্রকৃতির কোন সম্পদ–সম্পত্তি ক্রয় করে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে বাজার অনুসারে উক্ত প্রকল্প বা সম্পদের মাসিক বা বার্ষিক ভাড়া নির্ধারণ করে ব্যাংক এর অপর অংশীদারের কাছে প্রকল্প বা সম্পদটি ভাড়া দেয়। ব্যাংক এবং অপর অংশীদার তাদের নিজ নিজ পুঁজি বা মালিকানার অনুপাত অনুসারে নির্ধারিত ভাড়া ভাগ করে নেয়। এছাড়া গ্রাহক যাতে ভবিষ্যতে উক্ত প্রকল্প বা সম্পদের পূর্ণ মালিক হতে পারে, সেজন্য তাকে এক সাথে অথবা কিস্তিতে ব্যাংকের মালিকানাভুক্ত অংশের মূল্য (ব্যাংকের নিয়োজিত পুঁজি) পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হয়।

এভাবে চুক্তি অনুসারে ব্যাংক প্রকল্প বা সম্পদের উপর এর মালিকানা অংশের অনুপাতে নির্ধারিত ভাড়ার অংশসহ এর নিয়োজিত পুঁজির কিস্তি পেতে থাকে। কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে ব্যাংকের মালিকানা অংশ হ্রাস পায় এবং সে অনুপাতে ভাড়ার অংশও কমতে থাকে।

অবশেষে কিস্তি পরিশোধ শেষ হলে গ্রাহক উক্ত প্রকল্প বা সম্পদের পূর্ণ মালিক হয় এবং ভাড়া প্রদান থেকে মুক্ত হয়।

(২) ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া পদ্ধতি (Hire-Purchase) : এ পদ্ধতিতে ব্যাংক নিজেই প্রয়োজনীয় সাকুল্য অর্থ যোগান দিয়ে প্রকল্প, বাড়ী বা কোন স্থায়ী সম্পদের মালিক হয়; অতঃপর উক্ত প্রকল্প, বাড়ী বা সম্পদ গ্রাহকের কাছে ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া দেয়। গ্রাহক মাসিক বা বার্ষিক নির্ধারিত ভাড়া এবং ব্যাংকের নিয়োজিত পুঁজির কিস্তি পরিশোধ–সাপেক্ষে প্রকল্প, বাড়ী বা সম্পদ দখল ও ভোগ ব্যবহার করতে থাকে। ব্যাংকের পুঁজি যত পরিশোধ হয়, সে অনুসারে সম্পদের ভাড়ার পরিমাণ কমতে থাকে। কিস্তি সম্পূর্ণ পরিশোধ হলে গ্রাহক সম্পদের মালিকানা পায় এবং ভাড়া প্রদান থেকে মুক্ত হয়। কিস্তি ও ভাড়া সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকই সম্পদের মালিক থাকে। জমি, বাড়ী, গাড়ী, জাহাজ, কারখানা ইত্যাদি যে কোন প্রকল্প বা স্থায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে এ কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে সুবিধা হচ্ছে যে এতে ঝুঁকি অত্যন্ত কম এবং হিসাবপত্র তেমন কিছু রাখতে হয় না। তাছাড়া ইজারা পদ্ধতিতে ইজারাদার সম্পদের মালিক হতে পারে না। কিন্তু এ পদ্ধতি গ্রাহককে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়। মধ্যম এবং স্বল্পবিত্তের লোকদের পক্ষে বাড়ী, গাড়ী ও অন্যান্য সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য এটি একটি উত্তম পদ্ধতি। যারা সারা জীবন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকেন, তাদের জন্য বাড়ীর মালিক হওয়ার এটি একটি উত্তম সুযোগ।

ঞ) বিনিয়োগ নিলাম (Investment Auctioning) : কোন ব্যাংক অথবা কয়েকটি ব্যাংক নিয়ে গঠিত কোন কনসোর্টিয়াম যখন কোন প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ যোগান দেয়ার শর্তে উক্ত প্রকল্প পরিকল্পনা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে, তখন তাকে বিনিয়োগ নিলাম বলা হয়। অবশ্য এ পদ্ধতিতে ব্যাংক প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করে

www.pathagar.com

তা নিলামে দিতে পারে অথবা প্রকল্পের যাবতীয় কাজ শেষ করে উৎপাদন শুরু করার পূর্বে অথবা পরে অথবা প্রকল্পের যে কোন স্তরে তা নিলামে দিতে পারে। ব্যাংক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন খরচ, প্রকল্পের সম্ভাব্য সুনাম (Goodwill) মূল্য এবং ব্যাংকের বিনিয়োজিত পুঁজি ও মুনাফা ইত্যাদি হিসাব করে প্রকল্পের একটি সংরক্ষিত-দাম স্থির করে। অতঃপর ডাক-দাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত দরপত্র বা ডাক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সর্বোচ্চ ডাকদাতা অথবা সকল দিক বিবেচনায় ভাল মনে করলে অন্য যে কোন ডাক-দাতার কাছে প্রকল্প বিক্রি করতে পারে। ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে।

সমাজে এমন বহু লোক আছে যারা কোন কারবারের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ, যেমন-প্রকল্প প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় স্থান যোগাড় করা, সরকারী অনুমোদন নেয়া, যন্ত্রপাতি আমদানী, ক্রয় ও বসানো ইত্যাদি কাজকে অত্যন্ত ঝামেলাপূর্ণ মনে করে এবং এই ঝামেলার ভয়ে মূল কাজ থেকে পিছিয়ে থাকে। অথচ তারা যদি এসব ঝামেলামুক্ত কোন তৈরী প্রকল্প পায়, তাহলে অধিক মূল্যে তা কিনে নিতে দ্বিধা করে না। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নিলাম এ শ্রেণীর লোকদের জন্য একটি উত্তম সুযোগ। এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকের জন্যও লাভজনক এবং দেশের শিল্পায়নেও বেশ সহায়ক। কোন কোন বিশেষজ্ঞ অবশ্য বিনিয়োগ নিলাম শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে ব্যাংক যখন অসম্পূর্ণ প্রকল্প অথবা কেবলমাত্র পরিকল্পনা নিলামে দেয়, তখন ব্যাংক প্রকল্প তৈরী করা অথবা অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য পরিকল্পনায় উল্লেখিত অর্থ ক্রেতাকে দেয় এবং পরে ব্যাংক ডাক অনুযায়ী নির্ধারিত অতিরিক্ত দাম নেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অতিরিক্ত অর্থ অর্থের মূল্য তথা সুদের পর্যায়ে পড়ে এবং কখনো কখনো তা বিনিয়োগকারীর অবস্থা অধিকতর নাজুক করে তোলে।[২৭] তাছাড়া এতে ব্যাংকের কোন ঝুঁকি নেই। এ কারণে ডঃ এম. ওমর চাপরা ইসলামী ব্যাংককে শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছেন।[২৮]

ট) স্বাভাবিক মুনাফার হার (Normal Rate of Return) ঃ সাধারণতঃ খুচরা ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফেরীওয়ালা, চা-এর দোকান ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মুনাফার হারের ভিত্তিতে অর্থায়ন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে হিজবা এজেন্সী নামে সরকারী বা নিরপেক্ষ সংস্থা প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসা ও কারবার জরিপ করে প্রত্যেক খাতের প্রাপ্ত স্বাভাবিক মুনাফার হার বের করবে এবং সে অনুসারে প্রত্যেক খাতের জন্য স্বাভাবিক মুনাফার হার নির্ধারণ করে দিবে। ব্যাংক উক্ত মুনাফার হারে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এসব ক্ষুদ্র ও খুচরা ব্যবসায়ীদের অর্থ যোগান দিবে। অবশ্য চুক্তিতে এ শর্ত থাকতে

www.pathagar.com

হবে যে কারবারে প্রকৃত মুনাফা যদি নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশী হয়, তাহলে সে অতিরিক্ত লাভের অংশ ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় ব্যাংককে প্রদান করবে। অপরদিকে যদি প্রকৃত লাভ স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম হয় বা কারবারে যদি লোকসান হয় এবং তার যথার্থতা যদি প্রমাণ করা যায়, তাহলে ব্যাংক এর গৃহীত অতিরিক্ত লাভ ফেরত দিবে বা লোকসানের আনুপাতিক অংশ বহন করবে। সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফার হার আসলে কোন নির্ধারিত হার নয়, বরং একটি নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশল মাত্র। মূলনীতির দিক থেকে এটি শরীয়ত বিরোধী নয়।

কিন্তু যথার্থ হিসাবপত্র রাখা অসুবিধা বা রাখা হয় না বলেই যদি স্বাভাবিক মুনাফার হারের কথা বলা হয়, তাহলে আসল মুনাফার হার পাওয়ার উপায় কি? আসলে হিসাববিহীন কারবারে প্রকৃত মুনাফা বের করার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে ব্যবসায়ী নিজে। কারবারে বেশী হারে লাভ হলে সে হয়তো প্রকাশ নাও করতে পারে; আবার কম হারে লাভ হলে বা লোকসান হলে সে তা প্রমাণ করতে পারবে না; কারণ তার হিসাব নেই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক মুনাফার হার সুদের হারে পর্যবসিত হওয়ার আশংকা খুবই বেশী। তাছাড়া পূর্ববর্তী কোন বছর বা কয়েক বছরের গড় মুনাফার হারের ভিত্তিতে স্বাভাবিক মুনাফার হার নির্ধারণ করার বিষয়টিও শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশ্নাতীত নয়। তবে ডঃ এম. ওমর চাপরা লিখেছেন যে একই বছর একই পণ্যের মুদারাবাহ্ ব্যবসায়ী যে হারে মুনাফা অর্জন করবে, সেই হারকে স্বাভাবিক মুনাফার হার ধরা যেতে পারে। তবে কোন গ্রহণযোগ্য ফর্মূলার ভিত্তিতে স্বাভাবিক মুনাফার হার নিরূপণ করা সম্ভব হলেই কেবল তা করা যেতে পারে।[২৯] স্বাভাবিক মুনাফার হারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হলে কারবারী বা উদ্যোক্তার অদক্ষতা এবং অসততা-জনিত ক্ষতি থেকে ব্যাংক রেহাই পেতে পারে। তবে সুদের আশংকার দরুণ এ পদ্ধতির ব্যবহার না করাই উত্তম।

ঠ) পারস্পরিক সম-প্রডাক্ট ঋণ ব্যবস্থা (Time Multiple Counter Loan) ঃ পাকিস্তানের ইসলামিক ইডিওলোজি কাউন্সিল ইসলামী ব্যাংকের জন্য এ ধরনের বিনিয়োগ অনুমোদন করেছে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক এই শর্তে কোন গ্রাহককে অর্থ ধার দেয় যে অন্য সময়ে উক্ত গ্রাহক সমপরিমাণ অর্থ সমান সময়ের জন্য ব্যাংকে জমা রাখবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বলা যেতে পারে।

ধরা যাক, 'ক' ইসলামী ব্যাংক এর গ্রাহক 'খ'-কে ১ লাখ টাকা ১০ দিনের জন্য ধার দিল। এতে দৈনিক প্রডাক্ট হলো ১০ লাখ টাকা। এই ঋণের পরিবর্তে 'খ' অন্য সময়ে এমন পরিমাণ অর্থ এমন মেয়াদের জন্য ব্যাংকে রাখবে যাতে তার দৈনিক প্রডাক্ট ১০ লাখ টাকা হয়। অর্থাৎ 'খ'-কে ২ লাখ টাকা ৫ দিনের জন্য ব্যাংকে রাখতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ ধরনের সুবিধার শর্তে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে।

www.pathagar.com

ড) সেবা-মূল্যের বিনিময়ে ঋণ দান ঃ ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের বিশেষ প্রয়োজনে সেবা-মূল্যের (Service Charge) বিনিময়ে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিতে পারে। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করা এবং ব্যাংকের আমানত ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক এরূপ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। এরূপ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক যে সেবা-মূল্য গ্রহণ করে, কোন অবস্থাতেই তা ব্যাংকের প্রকৃত ব্যয়ের (Out of Pocket Expenses) অধিক হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে সুযোগ-ব্যয় (Opportunity Cost) গ্রহণ করা ব্যাংকের জন্য বৈধ নয়।[৩০] ইসলামী শরীয়তের এটাই দাবী।

ঢ) পণ্য-ব্যবসা (Commodity Trade) ঃ কোন কোন দেশে ইসলামী ব্যাংক সরাসরি পণ্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ব্যাংক দেশের ভিতরে এবং বাইরে থেকে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে লাভে বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাংকিং আইনে ব্যাংকের পক্ষে সরাসরি পণ্য-ব্যবসা করা নিষিদ্ধ। ইসলামী ব্যাংকিং-এর অনুমতি দেয়ার পর এ আইন সংশোধন করা আবশ্যক।

ণ) কমিশন বা লাভের ভিত্তিতে সরবরাহ ব্যবসা ঃ ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী কমিশনের ভিত্তিতে ক্রয় ও সরবরাহ করতে পারে। সরকার বা সরকার মনোনীত কোন প্রতিষ্ঠান যখন জনগণের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে চায়, তখন ইসলামী ব্যাংক কমিশন বা নির্ধারিত মুনাফার ভিত্তিতে সে দ্রব্য জনগণের কাছে বিক্রয় করতে পারে। এতে বিতরণ ব্যবস্থার ত্রুটি দূর হবে এবং মজুদদারী, কালোবাজারী এবং কাল্পনিক ঘাটতি সমস্যার সমাধান সহজ হবে।

৩. অন্যান্য কাজ

ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ ছাড়াও আরো কিছু অতিরিক্ত কাজ আঞ্জাম দেয়। ইসলামী ব্যাংকের এসব কাজকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

১. সেবা-মূল্য বা কমিশনের বিনিময়ে প্রদত্ত সেবা এবং
২. বিনামূল্যে দেয় সেবা।

সেবা-মূল্য বা কমিশনের বিনিময়ে প্রদত্ত সেবা ঃ ব্যাংক নির্ধারিত সেবা-মূল্য (Service Charge) এবং কমিশনের বিনিময়ে বহু ধরনের কাজ করে থাকে। বস্তুতঃ কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা কমিশন গ্রহণ সাধারণভাবে প্রচলিত ব্যবস্থা। ইসলামী শরীয়তেও এ ব্যাপারে অনুমোদন রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক এরূপ কাজের মাধ্যমে অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় বেশ আয় করে থাকে। নীচে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক) আভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স ঃ ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে কমিশন নিয়ে ডিমান্ড ড্রাফট, মেইল ট্রান্সফার, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার ইত্যাদির মাধ্যমে এক স্থান থেকে

www.pathagar.com

অন্যস্থানে অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণ করে থাকে। ব্যাংক সাধারণতঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত শাখা অথবা চুক্তিবদ্ধ অন্য ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদান করে।

খ) অর্থ কালেকশন ঃ ব্যাংক গ্রাহকের ডিডি, চেক, পে-অর্ডার ইত্যাদি গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা শাখা থেকে চেক, ডিডি ও পে-অর্ডারের অর্থ সংগ্রহ করে গ্রাহকের হিসাবে জমা করে দেয়। এ কাজের জন্য ব্যাংক সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে।

গ) ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান ঃ ব্যাংক গ্যারান্টি হচ্ছে আসলে একটি লিখিত অঙ্গীকারপত্র, যার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে দায় পরিশোধ অথবা চুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। গ্রাহক দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে গ্যারান্টি চুক্তি অনুসারে ব্যাংক সে দায় পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে অথবা গ্রাহক নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে ব্যাংক গ্যারান্টি মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে। ইসলামী ব্যাংক গ্যারান্টির সমপরিমাণ অর্থ অথবা অন্য কোন সম্পদ-সম্পত্তি জামানত রেখে ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক জামানত রেখে অথবা জামানত ছাড়াই গ্যারান্টি দিতে পারে।

কোন কোন ইসলামী ব্যাংক গ্যারান্টিপত্রে উল্লেখিত অর্থের উপর অতি নিম্নহারে ২% বা ৩% হারে কমিশন নিয়ে থাকে। তাদের যুক্তি হলো, গ্যারান্টি প্রদানে ঋণ দেওয়া হয় না, বরং সার্ভিস দেওয়া হয়। সুতরাং এতে সার্ভিস চার্জ নেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন কোন ইসলামী ব্যাংকের মতে, গ্যারান্টি কোন সার্ভিস নয় এবং ঋণও নয়; এটি একটি অঙ্গীকার। এর বিনিময়ে কমিশন নেয়া বৈধ নয়। তবে আনুষঙ্গিক প্রকৃত খরচ আদায় করায় কোন দোষ নেই।

ঘ) আভ্যন্তরীণ এলসি খোলা ঃ ইসলামী ব্যাংক আভ্যন্তরীণ ঋণপত্র খোলার মাধ্যমে মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে। আন্তর্জাতিক এলসি-র ন্যায় আভ্যন্তরীণ এলসিতেও ব্যাংক একই পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করে থাকে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

ঙ) লকার ভাড়া দান ঃ ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় লকার ভাড়া দেয় এবং গ্রাহকের অলংকারাদি, মূল[illegible]ন দলিলপত্র ইত্যাদি হেফাজত করে। ব্যাংক এর জন্য নির্ধারিত ভাড়া আদায় করে।

এছাড়া ইসলামী ব্যাং[illegible]ক্ষ থেকে বীমার প্রিমিয়াম, আয়কর, টেলিফোন বিল, বিদুৎ বিল প্রভৃতি প[illegible] গ্রাহকদের অছি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, গ্রাহকদের পক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কাজ করে।

বিনামূল্যে দেয় সেবা ঃ ইসলামী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ বা কমিশন গ্রহণ না করেও গ্রাহকদের বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে আমানতকারীদের হিসাবের স্টেটমেন্ট দান, পাশ বই দেওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

৪. সমাজ কল্যাণমূলক কাজ

১। করজে হাসানা প্রদান ঃ ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় সুদের ভিত্তিতে ওভার ড্রাফট (Over Draft), ডিমান্ড লোন (Demand Loan), নগদ ঋণ (Cash Credit) ইত্যাদি ঋণ সুবিধা দিতে পারে না। তবে গ্রাহকদের সাময়িক তারল্য ঘাটতি পূরণ করা এবং সমাজের দরিদ্র ও অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণার্থে করজে হাসানা বা হিতকর ঋণ দিয়ে থাকে। করজে হাসানা মানেই সুদমুক্ত বা হিতকর ঋণ। করজে হাসানা মঞ্জুর করার সময়ই ঋণ-গ্রহীতার সুবিধামত ঋণ পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এরূপ ঋণের উপর ব্যাংক অতিরিক্ত কিছু আদায় বা অন্যবিধ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। তবে ঋণ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও ঋণ আদায়ের জন্য কৃত প্রকৃত খরচ গ্রহণ করতে পারে।

২। যাকাত প্রদান ঃ বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমধর্মী কাজ হচ্ছে যাকাত প্রদান করা। ইসলামী ব্যাংক সকল ক্ষেত্রে ইসলামী নীতি-বিধান মেনে চলে। সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করা ইসলামে ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ইসলামী ব্যাংক তাই প্রতিবছর হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করার পর এর মূলধন ও সম্পদ-সম্পত্তির উপর নিয়ম মোতাবেক হিসাব করে যাকাত প্রদান করে থাকে। ব্যাংক যাকাতের অর্থ নির্দিষ্ট তহবিলে জমা করে এবং এ অর্থ শরীয়ত নির্ধারিত পথে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হয়।

৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময়

আন্তঃব্যাংক সম্পর্ক

সুদ ভিত্তিক ব্যাংকগুলো আজ দুনিয়া জুড়ে ব্যবসা করছে। পৃথিবীর সব দেশেই এসব ব্যাংক তাদের শাখা-জাল বিস্তার করে চলছে। কিন্তু তারপরেও আজকের দুনিয়ায় এককভাবে কোন ব্যাংকের পক্ষেই সকল দেশের সব অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। তাই সুদী ব্যাংকগুলোও একে অন্যের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং একে অপরের পক্ষে কাজ করে থাকে। বস্তুতঃ ব্যাংকের কাজের প্রকৃতিই এমন যে, এদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও লেনদেন ছাড়া সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে গ্রাহকদের সেবা করা সম্ভব নয়।

একই কারণে ইসলামী ব্যাংকও দেশে এবং বিদেশে ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ধারার অন্যান্য ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং যোগাযোগ ও লেনদেন করে থাকে। পৃথিবীর যে কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংককে কতিপয় সাধারণ ব্যাংকিং কাজ,

www.pathagar.com

যেমন-চেক গ্রহণ, চেক ভাঙ্গানো, নানা ধরনের ড্রাফট গ্রহণ ও প্রদান, বিবিধ বাণিজ্যিক লেনদেন এবং হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বিনিময় প্রভৃতি অবশ্যই করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে বাস্তব কারণেই ইসলামী ব্যাংককে দেশের ভিতরে ও বাইরে অন্যান্য ইসলামী ও সুদী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়।

একইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রেও ব্যাংককে বিদেশে বিভিন্ন ব্যাংক ও এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও লেনদেন করতে হয়।

ইসলামী ব্যাংক পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সুদ পরিহার করে দেশের ভেতরে ও বিদেশে ইসলামী ও অন্যান্য ব্যাংকের সাথে অর্থ লেনদেন ও অন্যান্য কাজ করে থাকে।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক ব্যাংককে এমন কিছু কাজ করতে হয় যাতে ব্যাংকের কোন অর্থ বিনিয়োগের দরকার হয় না বা কোন আর্থিক দায় সৃষ্টি হয় না। সুদী ব্যাংকগুলো এসব কাজ কমিশন বা আইনানুগ সেবা-মূল্যের (Service Charge) বিনিময়ে করে থাকে। ইসলামী শরীয়তে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা কমিশন নেওয়া সম্পূর্ণ বৈধ। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকও কমিশন, সেবা-মূল্য ইত্যাদির বিনিময়ে এসব কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যাংককে এমন কিছু কাজ করতে হয় যাতে ব্যাংকের অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় বা এতে আর্থিক দায় সৃষ্টি হয়, যেমন-বিল পরিশোধ করা। এরূপ ক্ষেত্রে সুদী ব্যাংকগুলো পরস্পর সুদের ভিত্তিতে লেনদেন করে থাকে। কোন ব্যাংক যে দিন কোন বিল পরিশোধ করে, সেদিন থেকে বিল সংগ্রহের দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য তার পরিশোধিত অর্থকে বিল ইস্যুকারী ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ হিসেবে গণ্য করে এবং এর উপর প্রচলিত হারে সুদ ধার্য ও আদায় করে । কিন্তু এসব কাজে ইসলামী ব্যাংক সুদ দেয় না এবং সুদ নেয় না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক নিম্নে উল্লেখিত সমঝোতার ভিত্তিতে অন্যান্য ইসলামী ও সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে।

ক) সমঝোতার ভিত্তিতে বিনা সুদে পরস্পরের কাজ করা ঃ ইসলামী ব্যাংক দেশে এবং বিদেশে অন্যান্য ইসলামী ও সুদী ব্যাংকের সাথে এরূপ সমঝোতা করে যে তারা বিনা সুদে একে অন্যের পক্ষে কাজ করবে; একে অন্যের কাছ থেকে প্রদত্ত ঋণের উপর কোন সুদ নেবে না। তবে এক্ষেত্রে সম্মত হারে কোন সেবা-মূল্যের (Service Charge) ব্যবস্থা থাকতে পারে।

খ) পারস্পরিক সম-প্রডাক্ট ঋণ ব্যবস্থা (Time Multiple Counter Loan) ঃ এই ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক ও করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক ঋণের ব্যবস্থা থাকে। এতে শর্ত থাকে যে, ইসলামী ব্যাংক কখনো করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করলে এর উপর করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংক কোন সুদ পাবে না। অনুরূপভাবে করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংকও তার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংক হতে একই সময়ের জন্য সমপরিমাণ ঋণ পাবে।

www.pathagar.com

গ) আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব সংরক্ষণ ঃ ইসলামী ব্যাংক দেশের ভেতরে এবং বাইরে অন্যান্য ইসলামী ও সুদী ব্যাংকের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে পরস্পরের কাছে চলতি হিসাবে অর্থ জমা রাখে। এ ধরনের জমায় ইসলামী ব্যাংক কোন মুনাফা নেয় না এবং সুদী ব্যাংকও কোন সুদ নেয় না। প্রয়োজনে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের পক্ষে দায় শোধ করার জন্য এ অর্থ ব্যবহার করে থাকে।

ঘ) মুদারাবাহ ভিত্তিতে পরস্পর আমানত সংরক্ষণ ঃ একে অপরের কাছে মুদারাবাহ ভিত্তিতে অর্থ আমানত রাখায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর কোন অসুবিধা নেই। ইসলামী ব্যাংকগুলো পরস্পর এরূপ আমানত সংরক্ষণ করে থাকে।

সমঝোতার ভিত্তিতে সুদী ব্যাংকও ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবাহ হিসাবে এর অর্থ জমা রাখে এবং ইসলামী ব্যাংক এরূপ আমানতের উপর যে হারে মুনাফা দেয়, তারা তা গ্রহণ করে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য সুদী ব্যাংকে মুদারাবাহ চুক্তিতে তার অর্থ জমা রাখে। সুদী ব্যাংক এরূপ অর্থ সুদের ভিত্তিতে না খাটিয়ে পণ্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা লাভ-লোকসান ভিত্তিক কারবারে খাটায় এবং চুক্তি অনুসারে অর্জিত মুনাফার অংশ ইসলামী ব্যাংককে দেয়।

চুক্তিবদ্ধ বিদেশী ব্যাংকে যেন যথেষ্ট নগদ অর্থ বা তরল সম্পদ (Liquid Asset) মজুদ থাকে, সে বিষয়ে ইসলামী ব্যাংককে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। বিদেশে কোন মক্কেল বা অন্য কোন ব্যাংকের নামে ইস্যুকৃত ঋণপত্র বা অন্য কোন দায় পরিশোধে করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংক যাতে কোন অসুবিধায় না পড়ে সেজন্য এ ব্যবস্থা থাকা জরুরী। ইসলামী ব্যাংক নিম্নোক্ত যে কোন উপায় অবলম্বন করে বিদেশী ব্যাংকের একাউন্টে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার ব্যবস্থা করে থাকে।

(ক) বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশী চেক খরিদ করে চুক্তিবদ্ধ বিদেশী ব্যাংকে ভাঙ্গানো এবং ঐ বৈদেশিক মুদ্রা ইসলামী ব্যাংকের একাউন্টে জমা রাখা।

(খ) অন্য যে কোন ব্যাংকের বিদেশে উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে ইসলামী ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা।

(গ) যে সকল বিদেশী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উদ্বৃত্ত রয়েছে, সে সব ব্যাংকের নামে চেক কেটে যে সব ব্যাংকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নেই সে সব ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর করা।

(ঘ) বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করে বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ করা।

www.pathagar.com

আমদানী বাণিজ্য

আমদানী ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকও ঋণপত্র খোলা, আমদানী বিল ভাঙ্গানো, বিল সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ করে থাকে এবং নিয়ম অনুযায়ী কমিশন, সার্ভিস চার্জ ও আনুষঙ্গিক খরচ আদায় করে।

ঋণপত্র খোলা (LC Opening) : ঋণপত্র খোলার ব্যাপারে সাধারণতঃ তিন রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যাংক এ সকল অবস্থাতেই শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে ঋণপত্র খুলে থাকে।

ক) একশ' ভাগ মার্জিনে এলসি ঃ প্রথম অবস্থায় আমদানীকারী গ্রাহক প্রস্তাবিত আমদানী পণ্যের মূল্যের সাকুল্য অর্থ নিজেই দেয় এবং ঋণপত্র (এলসি) খোলার প্রস্তাব করে। এরূপ এলসিকে ১০০% মার্জিন ভিত্তিক এলসি বা নগদ ভিত্তিক এলসি বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না। আমদানীকারক নিজের হিসাব থেকে আমদানী পণ্যের দাম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করে। এ ধরনের এলসি খোলার জন্য অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকও কেবল কমিশন, ডাক ও তার খরচ এবং প্রয়োজনে সংশোধনী খরচ নিয়ে থাকে।

খ) আংশিক মার্জিনে এলসি ঃ দ্বিতীয় অবস্থায় আমদানীকারক প্রস্তাবিত আমদানী পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার পরিবর্তে আংশিক মূল্য প্রদান করে এবং অবশিষ্ট মূল্য ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ে বা কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে এলসি খোলার প্রস্তাব দেয় । একে আংশিক মার্জিনে এলসি বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বাকী অর্থ ব্যাংক বিনিয়োগ করে। সুদী ব্যাংক এ অর্থের উপর নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক এক্ষেত্রে মুশারাকাহ ভিত্তিতে বাকী অর্থ যোগান দিয়ে আমদানীকারকের সাথে অংশীদার হয়। পণ্য আমদানীর পর তা বিক্রি করে যে লাভ হয় তা আমদানীকারক ও ব্যাংক পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ করে নেয়। আর লোকসান হলে প্রত্যেকের পুঁজির অনুপাতে তার অংশ বহন করে। এ ধরনের ক্ষেত্রে এলসি খোলার জন্য কৃত যাবতীয় খরচ পণ্যের দামের সাথে যোগ করে লাভ-লোকসান হিসাব করা হয়।

গ) শূন্য মার্জিনে এলসি ঃ তৃতীয় অবস্থায় আমদানীকারক প্রস্তাবিত আমদানী পণ্যের মূল্যের কোন অংশই নগদ দেয় না; বরং ভবিষ্যতে পরিশোধ করবে শর্তে ব্যাংককে সম্পূর্ণ দাম দেয়ার অনুরোধ করে। সুদী ব্যাংক এরূপ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করে পণ্য আমদানী করে দেয় এবং গ্রাহক যতদিন ঋণ পরিশোধ না করে ততদিন নির্ধারিত হারে এর উপর সুদ আদায় করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক এ ক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে সুদ আদায়ের পরিবর্তে দুই পদ্ধতিতে আর্থিক সহায়তা করে থাকে।

www.pathagar.com

প্রথমতঃ, বাই-মোয়াজ্জাল বা মুরাবাহা চুক্তিতে ব্যাংক সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ/ব্যয় করে পণ্য আমদানী করে এবং উভয়ের সম্মতিক্রমে এর সাথে মুনাফা যোগ করে নির্ধারিত দামে গ্রাহককে পণ্য সরবরাহ করে। গ্রাহক চুক্তির শর্ত অনুসারে পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ব্যাংক মুদারাবাহ পদ্ধতিতে গ্রাহককে পণ্য আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক হয় সাহিব আল-মাল এবং গ্রাহক হয় মুদারিব। ব্যাংক মুদারিবের পক্ষে এলসি খোলে এবং আনুষঙ্গিক ব্যাংকিং কাজ করে দেয়। এজন্য ব্যাংক নিয়ম অনুযায়ী কমিশন ও খরচাদি নিয়ে থাকে। মুদারিব মাল আমদানীর পর তা বিক্রি করে যে লাভ পায়, চুক্তির শর্ত অনুসারে তার অংশ ব্যাংককে দেয়। কিন্তু যদি লোকসান হয়, তাহলে তার সম্পূর্ণ দায় ব্যাংক বহন করে।

রপ্তানী বাণিজ্য

ইসলামী ব্যাংক রপ্তানী বাণিজ্যেও অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক ঋণপত্র-স্থাপনকারী ব্যাংকের এজেন্ট হিসেবে ঋণপত্র এডভাইজ (Advise) করে এবং রপ্তানীকারকের পেশকৃত বিল নেগোসিয়েট করে। এসব কাজের জন্য ব্যাংক নিয়ম অনুযায়ী কমিশন পায় এবং বিনিময় হারের পার্থক্য থেকে লাভ অর্জন করে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থ যোগান দিয়ে থাকে।

রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন

রপ্তানীকারক যদি পুঁজির অভাবে রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করতে অপারগ হয়, তাহলে ইসলামী ব্যাংক রপ্তানী পণ্য তৈরী, প্যাকিং ও বোঝাইয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা করে থাকে। এরূপ আর্থিক সহায়তাকে পণ্য-বোঝাই পূর্ব-অর্থায়ন (Pre-shipment Finance) বলা হয়। ইসলামী ব্যাংক এ ক্ষেত্রে নিম্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

ক) মুশারাকাহ ঃ এ পদ্ধতিতে রপ্তানী পণ্য উৎপাদন, প্যাকিং ও বোঝাই-এর জন্য ব্যাংক রপ্তানীকারকের সাথে মুশারাকাহ বা অংশীদারী ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে। পণ্য রপ্তানী থেকে প্রাপ্ত মুনাফা পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে উভয়ে ভাগ করে নেয় এবং লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে উভয়ে তা বহন করে।

(খ) মুদারাবাহ ঃ রপ্তানীকারক যদি পুঁজি সরবরাহ করতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়, তাহলে ব্যাংক মুদারাবাহ চুক্তির ভিত্তিতে তাকে পুঁজি যোগান দেয়। অতঃপর রপ্তানী বাণিজ্যে লাভ হলে মুদারাবাহ চুক্তির শর্ত অনুসারে পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে উভয়ে তা ভাগ করে নেয়। কিন্তু লোকসান হলে সম্পূর্ণ লোকসান ব্যাংক বহন করে।

www.pathagar.com

গ) বাই-সালাম ঃ ব্যাংক বাই–সালাম ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ করে পণ্য ক্রয়ের শর্তে রপ্তানীকারককে অগ্রিম দাম পরিশোধ করে দেয়। রপ্তানীকারক এ অর্থ খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করার পর ব্যাংক পণ্য সরবরাহ্ নিয়ে নিজেই রপ্তানী করে এবং মুনাফা অর্জন করে।

অর্থ আদান-প্রদান (Remittance)

রেমিট্যান্স দু'প্রকারের –অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। ডিডি, টিটি, এমটি, টিসি ইত্যাদির সাহায্যে বিদেশী ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে দেশে অর্থের আগমনকে অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স বলা হয়। অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকেও এরূপভাবে অর্থ আসে এবং ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে এ অর্থ গ্রহণ করে এবং প্রেরকের নির্দেশমত প্রাপককে প্রদান করে। ব্যাংক প্রয়োজনে কমিশন ও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে গ্রাহকের নামে আগত অর্থ কালেকশন করে থাকে। অপরদিকে ব্যাংক গ্রাহকের নির্দেশমত এর বিদেশী এজেন্টের উপর ডিডি, টিটি, এমটি ইত্যাদি ইস্যু করার মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করে। ব্যাংক সাধারণতঃ কমিশন ও সেবা–মূল্যের বিনিময়ে এসব কাজ করে থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ঃ ইসলামী ব্যাংক উপস্থিত ক্ষেত্রে এবং হাতে হাতে নগদ ভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়–বিক্রয় করে। ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত ক্রয়–মূল্য এবং বিক্রয়–মূল্যের পার্থক্য থেকে ব্যাংক মুনাফা পায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে বাকীতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়–বিক্রয় অনুমোদিত নয়। এজন্য কোন ইসলামী ব্যাংকই বৈদেশিক মুদ্রা অগ্রিম (Forward Purchase) ক্রয় করে না।

ট্র্যাভেলার্স চেক ঃ ব্যাংক ট্র্যাভেলার্স চেক ইস্যু করে এবং এর বিনিময়ে কমিশন নেয়। ব্যাংক ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙ্গানো এবং ক্রয়ের কাজও করে থাকে।

আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান ঃ ইসলামী ব্যাংক আর্থিক বা অন্যবিধ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে অথবা কোন জামানত ছাড়াই আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে। এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও সম্ভাব্যতা যাচাই ও আনুষঙ্গিক খরচ আদায় করে থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব ঃ ইসলামী ব্যাংক আল–ওয়াদিয়া ভিত্তিতে অথবা মুদারাবাহ্ চুক্তিতে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে অর্থ জমা নেয়। দেশের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনের (Exchange Control Rules) আওতায় যে কোন বিদেশী নাগরিক, মিশন, দূতাবাস, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং প্রবাসী চাকুরীজীবী নাগরিক এ ধরনের হিসাব খুলে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে পারে।

বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব আল–ওয়াদিয়া ভিত্তিক হলে আমানতকারীকে তার আমানতের উপর কোন লাভ দেয়া হয় না। কিন্তু মুদারাবাহ্ হিসাবের জমার উপর চুক্তি মুতাবেক লভ্যাংশ দেয়া হয় এবং লোকসান হলে জমাকারী তার অর্থের অনুপাতে লোকসান বহন করে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

শরীয়ত বোর্ড

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের জন্যেই ইসলামী শরীয়ত বোর্ড রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক যে ইসলামী শরীয়ত অনুসারেই পরিচালিত হচ্ছে, তা নিশ্চিত করছে এই শরীয়ত বোর্ড। ইসলামী ব্যাংক তার দৈনন্দিন কার্য-নির্বাহের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়, যে সব সন্দেহজনক বিষয়ের মুকাবিলা করে, সেগুলো এ বোর্ডের সম্মুখে পেশ করা হয়। শরীয়ত বোর্ড ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় এবং রায় দেয়। উপরন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংককে পরামর্শ দেয়ার দায়িত্বও এ বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। ইসলামী ব্যাংক শরীয়তসম্মতভাবে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত করছে কিনা সে ব্যাপারে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর নিকট প্রতি বছর ইসলামী শরীয়ত বোর্ড রিপোর্ট প্রদান করে থাকে।

শরীয়ত বোর্ডের গঠন

ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ও পূর্ণ আস্থাবান ইসলামী আইনবিদ, প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী শরীয়তে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ইসলামী শরীয়ত বোর্ড গঠিত হয়। তাঁরা তাকওয়া, পরহেজগারী, খোদাভীরুতা, পান্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে শুধু ব্যাংক কর্তৃপক্ষেরই নয়, দেশবাসীরও আস্থাভাজন হন।

ইসলামী শরীয়ত বোর্ডের সদস্যবৃন্দ যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন, সেজন্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ঃ

(ক) সদস্যদের কেউই যেন ব্যাংকে কর্মরত না হন এবং কোনভাবেই যেন ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর অধীনস্থ না হন।

(খ) ব্যাংকের সাধারণ সদস্য-সভায় যে ভাবে অডিটর নিযুক্ত হন, সে ভাবেই যেন শরীয়ত বোর্ডের সদস্য মনোনীত ও নিযুক্ত হন।

(গ) সাধারণ সভাই যেন তাঁদের সম্মানী নির্ধারণ করে।

(ঘ) অডিটরদের ন্যায় শরীয়ত বোর্ডের সদস্যদেরও যেন ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা থাকে।

(ঙ) এ বোর্ডের সদস্যদের যেন সহজেই পদচ্যুত করা না যায়।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ব্যাংকের শরীয়ত বোর্ডের মধ্যে সমন্বয়

বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শরীয়ত বোর্ডের মধ্যে তখনই সমন্বয় সাধন সম্ভব, যখন ইসলামী ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনের জন্য উচ্চতর ইসলামী শরীয়ত বোর্ড গঠন করা হবে। প্রতিটি ইসলামী শরীয়ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এই উচ্চ শরীয়ত বোর্ডের সদস্য হবেন। এছাড়া ইসলামী বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী আইনবিদ ও ফকিহ্দের মধ্যে থেকেও এ বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হবেন।

উচ্চতর ইসলামী শরীয়ত বোর্ড ইসলামী ব্যাংকসমূহের কাজ-কারবার পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ করবে, যেন ইসলামী শরীয়তসম্মতভাবে এসব ব্যাংক তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে। সকল ইসলামী ব্যাংকই এই উচ্চতর ইসলামী শরীয়ত বোর্ডের নির্দেশ, আদেশ ও উপদেশ মেনে চলবে।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মুদারাবাহ্ কারবারের শরয়ী বিধান

মুদারাবাহ কারবারের সংজ্ঞা

মুদারাবাহ্ হচ্ছে এমন এক ধরনের অংশীদারী কারবার যাতে দু'টি পক্ষ থাকে—এক পক্ষ কারবারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যোগান দেয় এবং আর এক পক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে লাভ করার উদ্দেশ্যে কারবার পরিচালনা করে। এখানে অর্থ যোগানদাতা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত-অংশীদার[১], সে কারবার পরিচালনায় অংশ নেয় না বা কারবারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। শরীয়তের ভাষায় অর্থ যোগানদাতাকে বলা হয় 'সাহিব আল-মাল' বা 'রব্বুল মাল' অর্থাৎ পুঁজির মালিক বা পুঁজির যোগানদাতা আর কারবার পরিচালককে বলা হয় মুদারিব বা পরিচালক বা উদ্যোক্তা। কারবারে লাভ হলে পূর্বাহ্নে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে পুঁজির মালিক ও মুদারিব উভয়ে তা ভাগ করে নেয়। কিন্তু কারবারে যদি লোকসান হয়, তাহলে সম্পূর্ণ আর্থিক লোকসানের বোঝা পুঁজির মালিককে বহন করতে হয়; এক্ষেত্রে মুদারিবের ব্যয়িত শ্রম ও সময় বৃথা যায়—এর বিনিময়ে সে কিছুই পায় না। তবে মুদারিবের কোন অবহেলা, ত্রুটি অথবা মুদারিব কর্তৃক চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার দরুন লোকসান হলে সে লোকসানের দায়িত্ব মুদারিবকেই বহন করতে হবে। বস্তুতঃ মুদারাবাহ হচ্ছে পুঁজি ও শ্রমের অংশীদারী কারবার। এখানে সাহিব আল-মালের পুঁজি হচ্ছে তার প্রদত্ত অর্থ আর মুদারিবের পুঁজি হচ্ছে তার প্রদত্ত শ্রম। ফিকাহবিদদের মতে, লোকসান হচ্ছে পুঁজির ক্ষয়; সুতরাং অর্থের মালিককে আর্থিক ক্ষতি এবং শ্রমের মালিককে শ্রমের ক্ষতি বহন করতে হয়। এজন্য কখনো কখনো মুদারাবাহ কারবারকে কেবল মুনাফায় অংশীদারী কারবার বলা হয়।[২]

মুদারাবাহ কারবারে মুদারিব হচ্ছে কারবারের ট্রাস্টী এবং এজেন্ট।[৩] কারবারের ট্রাস্টী হিসেবে মুদারিবকে পূর্ণ বিশ্বস্ততা, দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সাথে কারবার পরিচালনা করতে হয়। তার অবহেলা ও ইচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য লোকসান হলে সেজন্য সেই দায়ী হয়। এজেন্ট হিসেবে তাকে কারবারের পুঁজির এমন বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে, যাতে ইসলামী মূল্যবোধের সীমার মধ্যে থেকে কারবারে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।

হানাফী, হাম্বেলী ও যায়েদী ফিক্বাহ-এ ধরনের অংশীদারী কারবারকে মুদারাবাহ বলা হয়েছে। কিন্তু মালেকী ও শাফেয়ী মযহাবে এ কারবারকে বলা হয়েছে কিরাদ এবং পুঁজির মালিককে বলা হয়েছে মুকায়িদ।[৪]

www.pathagar.com

মুদারাবাহ্ কারবারে সাহিব আল–মাল ও মুদারিব উভয় পক্ষে এক বা একাধিক লোক বা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে। অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মূলধন যোগান দিতে পারে এবং একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কারবার পরিচালনা করতে পারে; অথবা এক ব্যক্তি অর্থ যোগান দিতে পারে এবং একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মুদারিব হিসেবে কারবার পরিচালনা করতে পারে; অনুরূপভাবে একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অর্থ যোগান দিতে পারে এবং এক ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান কারবার চালাতে পারে। ইসলামী শরীয়তে এসব ধরনের মুদারাবাহ্ কারবারকেই বৈধ বলা হয়েছে। [৫]

মুদারাবাহ্ কারবারের ধরন

চুক্তির শর্তের ভিত্তিতে মুদারাবাহ কারবারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(১) সাধারণ মুদারাবাহ্, (২) বিশেষ মুদারাবাহ্, (৩) মেয়াদী মুদারাবাহ্, ও (৪) বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ।

১. সাধারণ মুদারাবাহ ঃ মুদারাবাহ চুক্তিতে যদি কারবারের মেয়াদ, কারবারের ধরন বা বিশেষ কোন কারবারের উল্লেখ করা না হয়, তাহলে সে কারবারকে সাধারণ (Unrestricted) মুদারাবাহ কারবার বলা হয়।[৬] এ ধরনের কারবারে মুদারিব স্বাধীনভাবে যে কোন ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পে এবং যে কোন মেয়াদের জন্য মুদারাবাহ্ অর্থ বিনিয়োগ ও কারবার পরিচালনা করতে পারে এবং তার বিবেচনায় কারবারের জন্য যা ভাল তাই করতে পারে।[৭]

২. বিশেষ মুদারাবাহ ঃ মুদারাবাহ চুক্তিতে যখন কারবারের ধরন বা বিশেষ কোন কারবারের উল্লেখ করা হয়, তখন সে মুদারাবাহকে বলা হয় বিশেষ (Restricted)[৮] মুদারাবাহ। এ ধরনের মুদারাবাহ্ চুক্তিতে যে কারবার, প্রকল্প, ব্যবসা বা শিল্পের কথা উল্লেখ করা হয়, মুদারিবকে সেই কারবার, প্রকল্প, ব্যবসা বা শিল্পে মুদারাবাহ তহবিল বিনিয়োগ করতে হয়। অন্যথায় কারবারের পরিণতির জন্য তাকে দায়ী হতে হয়।

৩. মেয়াদী মুদারাবাহ ঃ মুদারাবাহ চুক্তিতে কারবারের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেওয়া হলে তাকে মেয়াদী মুদারাবাহ্ কারবার বলা হয়। নির্ধারিত মেয়াদশেষে এ ধরনের চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

৪. বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ ঃ বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ চুক্তিতে বিশেষ কারবার, প্রকল্প, ব্যবসা বা শিল্প নির্দিষ্ট করার সাথে সাথে কারবারের মেয়াদও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। মুদারিব নির্দিষ্ট কারবারে মুদারাবাহ্ অর্থ বিনিয়োগ করে এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কারবার পরিচালনা করে। মেয়াদ শেষ হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মুদারাবাহ্ কারবারের শর্তাবলী

শরীয়তে বর্ণিত মুদারাবাহ্ কারবারের শর্তাবলী নিম্নে আলোচনা করা হলো।

চুক্তি ঃ চুক্তিই হচ্ছে মুদারাবাহ্ কারবারের ভিত্তি। সুতরাং কারবার শুরু করার পূর্বেই কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সাহিব আল–মাল ও মুদারিবের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়া জরুরী। যেহেতু আল–কুরআনে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি লিখে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেজন্য মুদারাবাহ্ চুক্তি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৯] তবে চুক্তি যদি অলিখিত হয়, তাহলেও তা পালন করা উভয় পক্ষের জন্য অপরিহার্য। মুদারাবাহ্ কারবার যদি বিশেষ কোন কারবারের জন্য হয়, কিংবা যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়, অথবা যদি বিশেষ কারবারও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়, তাহলে চুক্তিতে তা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে। চুক্তিতে যদি উপরি–উক্ত বিষয়ে কিছু উল্লেখ না থাকে, তাহলে তা সাধারণ মুদারাবাহ্ কারবার বলে গণ্য হবে।

পুঁজি সরবরাহ ঃ চুক্তিতে সাহিব আল–মাল কর্তৃক দেয় মূলধনের পরিমাণ সুনির্ধারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তা সরাসরি মুদারিবের কাছে হস্তান্তর করতে হবে, যাতে মুদারিব যথাযথভাবে উক্ত পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে।

লাভ-লোকসান বন্টন

ইসলামী শরীয়তে কারবারের লাভ এবং ক্ষতির প্রকৃতিগত পার্থক্যের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং কারবারের অংশীদারদের মধ্যে লাভ–ক্ষতি বন্টনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নীতি প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মুনাফার অংশ নির্ধারণ ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে মুনাফা হচ্ছে কারবারের বিনিয়োজিত মূলধনের বর্ধিত অংশ। মূলধন এবং কারবার–প্রচেষ্টা (Entrepreneur) একযোগে কাজ করার ফলে মুনাফা অর্জিত হয়।[১০] বলা যায়, মুনাফা হচ্ছে পুঁজি ও শ্রমের সম্মিলিত কাজের ফসল। মুদারাবাহ্ কারবারে এক পক্ষ পুঁজি যোগান দেয়, অপর পক্ষ শ্রম নিয়োগ করে এবং এর ফলস্বরূপ মুনাফা অর্জিত হয়। সুতরাং মুদারাবাহ্ কারবারে অর্জিত মুনাফায় পুঁজির মালিক ও শ্রমের মালিকের প্রাপ্য অংশ রয়েছে। শরীয়ত উভয় পক্ষের মধ্যে মুনাফার অংশ নির্ধারণের জন্য নিম্নপদ্ধতি স্থির করে দিয়েছে।

মুদারাবাহ্ কারবারে মুদারিব ও সাহিব আল–মালের মধ্যে চুক্তি করার সময়েই মুনাফা বন্টনের ব্যাপারে ফায়সালা করতে হবে এবং তা সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে। এতে উভয় পক্ষের অংশ অর্জিত মুনাফার অনুপাত অথবা মুনাফার শতকরা হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে।[১১] অর্থাৎ বলতে হবে অর্জিত মুনাফার $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{৩}$ বা $\frac{১}{৪}$ ইত্যাদি অংশ সাহিব আল–মাল এবং বাকী অংশ মুদারিব পাবে; অথবা বলতে হবে, অর্জিত

www.pathagar.com

মুনাফার শতকরা ২৫, ৩০, ৫০, ৬০, ৭০ বা ৮০ ইত্যাদি ভাগ সাহিব আল-মাল পাবে এবং বাকী অংশ পাবে মুদারিব। কোন পক্ষের জন্য কোন নির্ধারিত অংকের মুনাফা, যেমন-৫০০, ১০০০, ৫০০০ ইত্যাদি নির্ধারণ করা যাবে না।[১২] কারণ কারবারের মুনাফা নির্ধারিত অংশ অপেক্ষা কমও হতে পারে অথবা কারবারে লোকসানও হতে পারে। সুতরাং কোন একপক্ষ বা উভয় পক্ষের জন্য নির্ধারিত কোন অংকের মুনাফা দেওয়ার কথা বলা হলে সেই মুদারাবাহ চুক্তি অবৈধ এবং বাতিল হয়ে যাবে। মুদারাবাহ কারবারে মুনাফা বন্টন ক্ষেত্রে উল্লেখিত দু'টি নীতির ব্যাপারে সকল মযহাবের ঐকমত্য রয়েছে।[১৩]

এখানে উল্লেখ্য, মুদারাবাহ কারবারে শরীয়ত কেবল নির্ধারিত অংকের মুনাফা নির্ধারণ নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু মুনাফা বন্টনের অনুপাত বা হার নির্ধারণের বিষয়ে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ বা সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে পূর্ণ এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তারা পরস্পর আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ, অর্থনৈতিক অবস্থা ও কারবারের লাভালাভ বিশ্লেষণ করে মুনাফা বন্টনের যে অনুপাত বা হার নির্ধারণ করবে, সেটাই বৈধ বলে বিবেচিত হবে।[১৪]

লোকসানের দায় বহন ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে কারবারের লাভ যেমন পুঁজি বৃদ্ধি পাওয়া, তেমনি লোকসান হচ্ছে পুঁজি হ্রাস পাওয়া।[১৫] লাভ অর্জিত হয় পুঁজি ও শ্রমের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে; সুতরাং উভয়েই লাভের অংশীদার হয়। কিন্তু লোকসান পুঁজি ও শ্রমের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে অর্জিত নয়; বরং পুঁজি ও শ্রমের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লোকসান হয়ে যায়।[১৬] মুদারিব সাহিব আল-মালের পুঁজি খাটিয়ে প্রচেষ্টা চালায় যাতে পুঁজি বৃদ্ধি পায় এবং সেও তার অংশ পেতে পারে। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুঁজি বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে যখন হ্রাস পায়, তখনই কারবারে লোকসান হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে শরীয়তের নীতি হচ্ছে, যে পুঁজির হ্রাসপ্রাপ্ত অংশ বা লোকসান পুঁজির উপরই বর্তাবে এবং সে লোকসান পুঁজির মালিক বা মালিকদের মধ্যে প্রত্যেকের পুঁজির আনুপাতিক হারে ভাগ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মুদারিবের লোকসান হবে তার নিয়োজিত শ্রম ও সময়। কোন মুদারাবাহ কারবারে যদি আর্থিক লোকসানের কোন অংশ মুদারিবের উপর চাপানো হয়, তাহলে সে চুক্তি অবৈধ এবং বাতিল বলে গণ্য হবে।[১৭] সকল মযহাবই এ ব্যাপারে একমত।[১৮] তবে মুদারিবের কোন ইচ্ছাকৃত ত্রুটি বা চুক্তিভঙ্গের কারণে লোকসান হলে তার দায়িত্ব মুদারিবকেই বহন করতে হবে।[১৯]

এছাড়া মুদারাবাহ কারবারে মুদারিব হচ্ছে সাহিব আল-মালের আমানতদার (Trustee) ও প্রতিনিধি (Agent), সে পূর্ণ আমানতদারী, নিষ্ঠা ও সততার সাথে প্রতিনিধি হিসেবে এই শর্তে কারবার পরিচালনা করে যে কারবারে লাভ হলে লাভের নির্ধারিত অংশ সে পাবে। সুতরাং স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কারণে লোকসান হয়ে আমানতী মূলধন খোয়া

www.pathagar.com

গেলে বা খোদায়ী কোন দুর্যোগের দরুন আমানতী অর্থ বিনষ্ট হলে মুদারিবের কাছ থেকে এর ভর্তুকী আদায় করা যাবে না।[২০]

লাভ-লোকসান নিরূপণ ও বন্টন ঃ মুদারাবাহ্ কারবার সমাপ্ত হওয়ার পর হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করে প্রাপ্ত নীট মুনাফা (Net Profit) পূর্ব-নির্ধারিত হার বা অনুপাতে মুদারিব ও সাহিব আল-মালের মধ্যে বন্টন করতে হবে।[২১] যদি দেখা যায় কারবারে লোকসান হয়েছে, তাহলে সাহিব আল-মাল তা বহন করবে।[২২] পূর্বে কোন লোকসান হয়ে থাকলে তা পূরণ না করে এবং সাহিব আল-মালের বিনিয়োজিত সম্পূর্ণ মূলধন প্রত্যর্পণ বা পৃথকভাবে সংরক্ষণ না করে মুনাফা বন্টন করা বৈধ নয়।[২৩] হিসাব চূড়ান্তকরণ এবং চূড়ান্ত নীট মুনাফা নিরূপণ করার পূর্বে সাহিব আল-মাল বা মুদারিব যদি কোন মুনাফা গ্রহণ করে, তাহলে তা অগ্রিম (Advance) হিসেবে গণ্য হবে এবং চূড়ান্ত মুনাফা বন্টনকালে এই অগ্রিম সমন্বয় করতে হবে।[২৪]

স্থায়ী প্রকৃতির চলমান (Continuing) মুদারাবাহ্ কারবারের বেলায় মুদারিব ও সাহিব আল-মালের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মুনাফা বন্টনের জন্য হিসাব-কাল (Accounting Period) নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং প্রত্যেক হিসাব-কালকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র (Independent) ধরে নিয়ে সেই কালের হিসাব চূড়ান্ত ও লাভ-লোকসান বন্টন করা যেতে পারে।[২৫] তবে এরূপ ক্ষেত্রে কোন হিসাব-কালে লোকসান হলে পরবর্তীকালে অর্জিত মুনাফা থেকে সে লোকসান পূরণ করতে হবে। সেজন্য ডঃ এম. ওমর চাপরা চলমান মুদারাবাহর ক্ষেত্রে মুনাফা থেকে একটা অংশ কেটে রেখে ক্ষতিপূরণ তহবিল (Loss Offsetting Reserve) গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন।[২৬]

সাহিব আল-মালের পুঁজি প্রত্যর্পণ

মুদারাবাহ কারবার সমাপ্ত করার সময় কারবারের জন্য ক্রীত যাবতীয় মূলধন-সামগ্রীসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করে প্রথমে সাহিব আল-মাল কর্তৃক প্রদত্ত সাকুল্য পুঁজি প্রত্যর্পণ করতে হবে। এক্ষেত্রে মূল পুঁজিতে যদি কোন ঘাটতি হয়, তাহলে সে ঘাটতিকে কারবারের লোকসান হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং সে ঘাটতিসহ সাহিব আল-মালকে তার অবশিষ্ট পুঁজি ফেরত দিতে হবে। আর যদি মূল পুঁজি পূরণ করার পর উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে তা হবে কারবারের মুনাফা এবং এ মুনাফা পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে।

কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

কারবারের স্বাভাবিক কাজ ও লেনদেন ঃ মুদারাবাহ কারবারে কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মুদারিবের উপর ন্যস্ত থাকে। সাহিব আল-মালের আমানতদার প্রতিনিধি হিসেবে মুদারিব চুক্তির শর্তানুসারে কারবারের যাবতীয় স্বাভাবিক

www.pathagar.com

লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় করে। জায়গা-জমি ও দালান-কোঠা ক্রয় বা ভাড়া করা, প্রয়োজনীয় যানবাহন সংগ্রহ করা, শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ করা, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা, কাঁচামাল ক্রয়, ব্যবসায়ের মাল ক্রয় ও বিক্রয় করা ইত্যাদি হচ্ছে যে কোন কারবারের মূলকথা, এসব ছাড়া কারবারের কথা চিন্তাও করা যায় না। মুদারিবকে এসব কাজ ও লেনদেন অবশ্যই করতে হবে।

এছাড়া কারবার-ব্যাপদেশে মুদারিবকে যদি নিজ শহরের বাইরে যাতায়াত ও অবস্থান করতে হয়, তাহলে সফর-কালে সে তার পানাহার, পোষাক-আশাক এবং পরিবহণ খরচ, নিজের কাপড় ধোলাই খরচ, নিজের খিদমতের জন্য নিযুক্ত ভৃত্যের বেতন এবং তাঁকে বহনকারী পশুর ঘাস-পাতার খরচ (বর্তমান যুগে রেল, বাস, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি যানবাহনের ভাড়া) বাবদ যাবতীয় ব্যয় কারবার থেকে বহন করতে পারবে।[২৭] কিন্তু নিজ শহরে অবস্থান-কালে মুদারিব তার নিজের পানাহার ও পোষাক-আশাক এবং নিজস্ব কোন খরচ কারবার থেকে বহন করতে পারবে না।[২৮] এছাড়া মুদারিবকে তার কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক বা বেতন-ভাতা প্রদান করাও বৈধ নয়।[২৯]

মোটকথা, কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দরকারী লেনদেনসহ কারবারের অপরিহার্য ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সমাধান করা মুদারিবেরই দায়িত্ব; এসবের জন্য সাহিব আল-মালের কোন বিশেষ অনুমতির দরকার হয় না। বরং কারবারের স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ বা মুদারিবের কাজে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সাহিব আল-মালের নেই। তবে সে কারবারের তদারকী করতে পারে। এছাড়া মুদারিব যদি কখনো তাকে সাহায্য করার জন্য সাহিব আল-মালকে অনুরোধ করে, তাহলে সাহিব আল-মাল প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে।[৩০]

মুদারাবাহ কারবারে মুদারিবের এসব স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ব্যবসায়িক কার্যাবলী ছাড়াও শরীয়তে আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ ঃ মুদারাবাহ কারবারে মুদারিব সাহিব আল-মালের সাধারণ অনুমতি অথবা বিশেষ অনুমতিক্রমে নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মুদারিব কর্তৃক বিনিয়োজিত পুঁজির লাভে সাহিব আল-মালের কোন অধিকার থাকবে না; আবার লোকসান হলে তার কোন দায়িত্বও সাহিব আল-মাল বহন করবে না। এরূপ কারবারে লাভ হলে মুদারিব তার পুঁজি আনুপাতিক হারে লাভ গ্রহণ করার পর অবশিষ্ট লাভ পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে সাহিব আল-মাল ও মুদারিবের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কিন্তু কারবারে লোকসান হলে মুদারিবের পুঁজির আনুপাতিক লোকসান মুদারিবকেই বহন করতে হবে এবং অবশিষ্ট লোকসান সাহিব আল-মাল বহন করবে।

www.pathagar.com

মুদারাবাহ ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে সংগৃহীত পুঁজি বিনিয়োগ ঃ মুদারিব সাহিব আল-মালের সাধারণ অনুমতি অথবা বিশেষ অনুমতিক্রমে তৃতীয় পক্ষের এক বা একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে মুদারাবাহ চুক্তির ভিত্তিতে অতিরিক্ত পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল চুক্তির অধীনে সংগৃহীত অর্থ একত্রে মিলিয়ে মুদারাবাহ কারবার পরিচালনা করতে পারে।[৩২]

মুদারাবাহ কারবারে মুদারিব মুশারাকা চুক্তির ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের এক বা একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ এবং মুদারাবাহ কারবারে বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে সাহিব আল-মালের অনুমতি থাকতে হবে।[৩৩]

মুদারাবাহ অর্থ ভিন্ন মুদারাবাহ কারবারে বিনিয়োগ ঃ মুদারাবাহ চুক্তিতে সংগৃহীত অর্থ মুদারাবাহ ভিত্তিতে অন্য কারবারে বিনিয়োগ করা যায় কিনা, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ ব্যাপারে সকল মযহাবই একমত যে সাহিব আল-মালের অনুমতি ছাড়া মুদারিবের পক্ষে মুদারাবাহ্ ভিত্তিতে সংগৃহীত পুঁজি আবার মুদারাবাহ চুক্তিতে বিনিয়োগ করা বৈধ নয়। হানাফী, মালেকী ও হাম্বেলী ফিক্বাহবিদদের মতে, সাহিব আল-মাল অনুমতি দিলে মুদারিব মুদারাবাহ পুঁজি মুদারাবাহ ভিত্তিতে অন্য কারবারে বিনিয়োগ করতে পারে।[৩৪] শাফেয়ী ফক্বীহদের এক দল মনে করেন যে কোন অবস্থাতেই মুদারাবাহ পুঁজি আবার মুদারাবাহ ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার অধিকার মুদারিবের নেই।[৩৫] তবে শাফেয়ী মযহাবের অন্যান্য ফক্বীহগণ অবশ্য এরূপ বিনিয়োগ করা যায় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩৬]

মুনাফা গ্রহণে মধ্যস্থতাকারীর অধিকার ঃ মুদারাবাহর অধীনে মুদারাবাহ কারবার করা হলে প্রথম মুদারিব আসলে নিজে কোন্ কারবার করে না; বরং সে প্রথমে সাহিব আল-মালের সাথে কৃত মুদারাবাহ চুক্তির মাধ্যমে পুঁজি গ্রহণ করে; অতঃপর নিজে সাহিব আল-মালের প্রতিনিধি হিসেবে ভিন্ন আর একটি মুদারাবাহ চুক্তির মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত পুঁজি সরবরাহ করে। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় মুদারিবই উক্ত পুঁজি খাটিয়ে কারবার করে। দ্বিতীয় মুদারিব কারবারে যে মুনাফা অর্জন করে, সে মুনাফা তার এবং প্রথম মুদারিব বা মূল সাহিব আল-মালের প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে বন্টন করা হয়। এভাবে প্রথম মুদারিব যে মুনাফা পায়, তা আবার তাঁর এবং মূল সাহিব আল-মালের মধ্যে পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে বন্টন করা হয়। এরূপে আসলে মধ্যস্থতাকরিী হিসেবে প্রথম মুদারিব মুনাফার অংশ লাভ করে। মধ্যস্থতাকারীর জন্য উক্ত মুনাফা অর্জন বৈধ কিনা এ প্রশ্নে হাম্বেলী মযহাবের ফক্বীহ ইবনে কুদামা নেতিবাচক মত ব্যক্ত করেছেন।[৩৭] তাঁর মতে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম মুদারিব কারবারে তাঁর নিজস্ব পুঁজি নিয়োগ করেন না এবং কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন শ্রমও নিয়োগ করেন না।

www.pathagar.com

কিন্তু হানাফী, মালেকী মযহাবের সকল ফক্বীহ এবং শাফেয়ী মযহাবের বেশ কয়েকজন ফক্বীহও প্রথম মুদারিব কর্তৃক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অর্জিত মুনাফা সম্পূর্ণ বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩৮] এ ব্যাপারে ভাসানি বলেছেন, দ্বিতীয় মুদারিব প্রথম মুদারিবের পক্ষে কাজ করে, যেন আসলে কাজটি প্রথম মুদারিবই সম্পন্ন করেছেন। সুন্দর একটি উদাহরণের মাধ্যমে তিনি বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, ধরা যাক, কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ১ দিরহাম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটি কাপড় ধোলাই করতে দিলো। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি এই কাজের জন্য আধা দিরহাম দেওয়ার শর্তে অন্য আর একজন লোককে নিয়োগ করলো এবং ধোলাইয়ের কাজ শেষ করলো। এখন নিযুক্ত ব্যক্তি এখানে কাজ না করেই আধা দিরহাম লাভ পেলো। তার এ লাভ সম্পূর্ণ বৈধ; কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পক্ষে কাজটি এরূপে করেছে যেন প্রথম ব্যক্তিই কাজটি করেছে।[৩৯]

উল্লেখিত উদাহরণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, আসল কথা হচ্ছে মুদারিবের দায়িত্ব পালন করা। এ দায়িত্ব সে নিজে পালন করুক বা তার নিযুক্ত কোন কর্মচারীর দ্বারা করুক অথবা মুনাফার অংশদানের ভিত্তিতে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা করুক অথবা কোন পারিশ্রমিক বা মুনাফার অংশ না দিয়ে কারো দ্বারা কাজটি করিয়ে নিক, তাতে মুদারিবের মুনাফার অংশ লাভের অধিকার খর্ব হয় না। সাহিব আল-মালের সাথে কৃত চুক্তির শর্ত অনুসারে সে মুনাফার অংশ পাবে এবং দ্বিতীয় মুদারিবের কাছে থেকে শর্ত অনুসারে মুনাফা গ্রহণ করতে পারবে।[৪০] সুতরাং মুদারাবাহ তহবিল আবার মুদারাবাহ চুক্তিতে বিনিয়োগ করা বৈধ এবং প্রথম মুদারিব কর্তৃক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অর্জিত মুনাফাও সম্পূর্ণ বৈধ।[৪১]

মুদারাবাহ তহবিল মুশারাকাহ ভিত্তিতে বিনিয়োগ ঃ মুদারাবাহ চুক্তির ভিত্তিতে সংগৃহীত তহবিলের দ্বারা মুদারিব অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে মুশারাকাহ ভিত্তিতে কারবারে অংশগ্রহণ ও মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও সাহিব আল-মালের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। হানাফী, হাম্বেলী ও মালেকী মযহাবে ফক্বীহদের অভিমত হচ্ছে, সাহিব আল-মাল অনুমতি দিলে মুদারিব মুদারাবাহ তহবিলের দ্বারা যৌথ কারবার করতে পারে এবং এরূপ যৌথ কারবার থেকে অর্জিত মুনাফা পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে সাহিব আল-মাল ও মুদারিবের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে।[৪২]

ঋণ গ্রহণ ও ঋণ দান ঃ সাহিব আল-মালের সুস্পষ্ট অনুমোদন ব্যতীত মুদারাবাহ কারবারের জন্য ঋণ গ্রহণ বা কারবারের তহবিল থেকে অন্যকে ঋণ প্রদান করার কোন অধিকার মুদারিবের নেই।[৪৩] এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মুদারাবাহ তহবিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে কারবারের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা; কিন্তু ঋণ থেকে মুনাফা পাওয়া যায় না। সুতরাং মালিকের অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ থেকে ঋণ দেওয়া যেতে পারে না। অপরদিকে ঋণ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে কারবারের দায় বৃদ্ধি করা যা প্রকৃতপক্ষে পুঁজি মালিকের উপর বর্তায়। সুতরাং সাহিব আল-মালের সুস্পষ্ট সম্মতি না থাকলে ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে না। তবে

www.pathagar.com

মুদারিব যেজন্য সাহিব আল–মালের প্রতিনিধি, সেজন্য সাহিব আল–মালের সুস্পষ্ট অনুমতি থাকলে মুদারিব কারবারের জন্য ঋণ গ্রহণ ও কারবারের তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করতে পারে।[৪৪]

ব্যক্তিগতভাবে ঋণ গ্রহণ ও মুদারাবাহ কারবারে বিনিয়োগ ঃ মুদারিব ব্যক্তিগতভাবে এবং নিজ দায়িত্বে ঋণ গ্রহণ এবং সে ঋণের অর্থ মুদারাবাহ্ কারবারে বিনিয়োগ করতে পারে কিনা, এ প্রশ্নে বলা হয়েছে,এটি ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার এবং মুদারাবাহ চুক্তির ফলে তার এ অধিকার বিনষ্ট হয় না।[৪৫] মুদারিব ব্যক্তিগতভাবে এবং নিজের দায়িত্বে যে কোন পরিমাণ অর্থ ধার করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে সাহিব আল–মালের অনুমতিক্রমে মুদারাবাহ্ কারবারে সে অর্থ বিনিয়োগও করতে পারে।[৪৬] তবে এ অর্থ মুদারিবের নিজস্ব পুঁজি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং মুদারাবাহ্ কারবারে মুদারিবের নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ করলে যে সব শর্ত পালন করতে হয়, এক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। এ পুঁজির সম্পূর্ণ লাভ মুদারিব পাবে; সাহিব আল–মালের এতে কোন অধিকার থাকবে না। কারবারে নীট যে লাভ হবে, তা থেকে প্রথমে মুদারিবের নিজ দায়িত্বে ধারকৃত পুঁজির আনুপাতিক মুনাফা মুদারিবকে প্রদান করতে হবে। অতঃপর অবশিষ্ট মুনাফা সাহিব আল–মাল ও মুদারিবের মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী বন্টিত হবে। অপরদিকে এরূপ পুঁজির লোকসানের সম্পূর্ণ দায়িত্বও মুদারিবকে বহন করতে হবে; সাহিব আল–মাল এরূপ লোকসানের কিছুই বহন করবে না। কারবারে লোকসান হলে প্রথমে মুদারিবের পুঁজির আনুপাতিক লোকসান মুদারিবকে ভাগ করে দেওয়ার পর অবশিষ্ট লোকসান সাহিব আল–মাল বহন করবে।[৪৭]

ধারে ক্রয়-বিক্রয় ঃ ধারে বিক্রয় ছাড়া কোন কারবার চালানো প্রায় অসম্ভব। বলা যায়, ধারে ক্রয়–বিক্রয় একটি আন্তর্জাতিক প্রথায় পরিণত হয়েছে। আর এতে লাভও হয় বেশী। মুদারিবকে যদি ধারে বিক্রি করার এখতিয়ার দেওয়া না হয়, তাহলে একদিকে কারবার সম্প্রসারণ দুঃসাধ্য হবে, অন্যদিকে মুনাফাও হ্রাস পাবে। এসব দিক বিবেচনা করে ফক্বীহগণ সাধারণভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, মুদারাবাহ্ কারবারে মুদারিব ধারে মাল বিক্রয় করতে পারে এবং এজন্য ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য প্রদত্ত সাধারণ এখতিয়ারই যথেষ্ট, ধারে বিক্রয়ের জন্য পৃথক আর কোন অনুমতির দরকার নেই।[৪৮] তবে সাহিব আল–মাল যদি চুক্তিকালে অথবা পরবর্তীতে ধারে মাল বিক্রয় করতে বাধা দেয় বা মানা করে, তাহলে মুদারিবকে সে শর্ত মেনে চলতে হবে।

অনুরূপভাবে মুদারিব ধারে মালামাল ক্রয় করতে পারবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে; তবে ধারে ক্রীত মালের মূল্য যাতে কারবারের মোট পুঁজির চেয়ে বেশী না হয়, সেদিকে মুদারিবকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোট পুঁজির চেয়ে অধিক মূল্যের পণ্য

www.pathagar.com

ধারে ক্রয় করতে হলে অবশ্যই সাহিব আল-মালের নিকট থেকে সুস্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।[৪৯]

সাহিব আল-মালের নিকট থেকে সুস্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ করে মোট পুঁজির অতিরিক্ত মূল্যের মাল ধারে কেনা হলে, সেই অতিরিক্ত মাল সাহিব আল-মাল ও মুদারিবের যৌথ সম্পদ এবং মালের মূল্য তাঁদের যৌথ ঋণ হিসেবে গণ্য করতে হবে। হানাফী ফক্বীহদের মতে, এক্ষেত্রে মুদারিব ও সাহিব আল-মাল শিরকতে অজুহ্-এর ভিত্তিতে পরস্পর অংশীদার হবে এবং মালের মূল্য পরিশোধে উভয়েই সমভাবে দায়ী থাকবে। এতে লাভ হলে তা তারা সমহারে ভাগ করে নেবে এবং লোকসান হলে তাও সমহারে বহন করবে।[৫০]

মুদারাবাহ কারবারে আর্থিক দায় ঃ সাধারণভাবে মুদারাবাহ কারবারে সাহিব আল-মালের আর্থিক দায় তার বিনিয়োজিত পুঁজি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।[৫১] কিন্তু যদি ঋণ গ্রহণ বা ধারে মাল-ক্রয়ের মাধ্যমে কারবার সম্প্রসারিত করা হয়, তাহলে সাহিব আল-মালের আর্থিক দায় সমপরিমাণে বেড়ে যাবে।

মুদারাবাহ চুক্তির সমাপ্তি ঃ মুদারাবাহ চুক্তি যদি বিশেষ কোন কারবারের জন্য করা হয়, তাহলে সে কারবার শেষ হলে মুদারাবাহ চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কোন নির্ধারিত মেয়াদের জন্য মুদারাবাহ চুক্তি সম্পাদন করা হলে সেই নির্ধারিত মেয়াদ শেষে উভয় পক্ষ চুক্তি নবায়ন করার সিদ্ধান্ত না করলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সাহিব আল-মাল ও মুদারিবের মধ্যে যে কোন পক্ষ যে কোন সময়ে নোটিশ দিয়ে মুদারাবাহ চুক্তির অবসান ঘটাতে পারে।[৫২] তবে উভয় পক্ষ একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থাকলে তারা কারবার চালু রাখতে পারে।[৫৩] সাহিব আল-মাল বা মুদারিবের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে মুদারাবাহ চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। তবে উভয় পক্ষে একাধিক ব্যক্তি থাকলে তারা কারবার বহাল রাখতে পারে।[৫৪]

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

মুশারাকাহ কারবারের শরয়ী বিধান

মুশারাকাহ কারবারের সংজ্ঞা

শিরক থেকে মুশারাকাহ বা শিরকতের উদ্ভব; এর অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। মুশারাকাহ কারবার হচ্ছে এমন অংশীদারী কারবার যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাভ করার উদ্দেশ্যে কারবার করার জন্য পুঁজি যোগান দেয়, কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে এবং কারবারের লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেয়। কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়; আর লোকসান হলে অংশীদারগণ নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করে।

মুশারাকাহ কারবারের শ্রেণী

শিরকত প্রধানতঃ দুই প্রকার হতে পারেঃ (১) শিরকাতুল মিল্ক (মালিকানা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব), একে চুক্তিবিহীন অংশীদারিত্বও বলা হয়; (২) শিরকাতুল উকুদ (চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্ব)।

১. শিরকাতুল মিল্ক ঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ না হয়ে যদি যৌথভাবে কোন সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে, তাহলে শিরকাতুল মিল্কের উদ্ভব ঘটে। অতঃপর মালিকগণ নিজ নিজ মালিকানার অনুপাতে উক্ত সম্পত্তির অংশীদার হয় এবং এর আয় ভাগ করে নেয়। যদি সম্পদ বিভাজ্য হয় (যেমন জমি), তাহলে তারা তা ভাগ করে নিতে পারে; অথবা যদি সম্পদ বিভাজ্য না হয় (যেমন জাহাজ), তাহলে তা বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ আয় ভাগ করে নিতে পারে। বস্তুতঃ শিরকাতুল মিল্ক লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্ত চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত কোন অংশীদারী কারবার নয়; বরং সম্পত্তির উপর যৌথ মালিকানাই এর মূলকথা। যথার্থ অর্থে অংশীদারী কারবার একে বলা যায় না।[১]

শিরকাতুল মিল্ক আবার দুই প্রকার হতে পারেঃ (ক) শিরকাতুল মিল্ক বিল এখতিয়ার বা স্বেচ্ছামূলক মালিকানা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব বা স্বেচ্ছামূলক চুক্তিবিহীন অংশীদারিত্ব এবং (খ) শিরকাতুল মিল্ক বিল জাবার[২] বা বাধ্যতামূলক মালিকানা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব বা বাধ্যতামূলক চুক্তিবিহীন অংশীদারিত্ব।

(ক) শিরকাতুল মিল্ক বিল এখতিয়ার ঃ যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পদ বিভাজ্য হওয়া সত্ত্বেও অংশীদারগণ যদি নিজেদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে না নেয় এবং যৌথ মালিকানায় রাখার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে তাকে শিরকাতুল মিল্ক বিল এখতিয়ার বা স্বেচ্ছামূলক চুক্তিবিহীন অংশীদারিত্ব বলা হয়।

www.pathagar.com

(খ) শিরকাতুল মিল্ক বিল জাবার ঃ কিন্তু সম্পত্তি যদি অবিভাজ্য হয় এবং অংশীদারগণ একে যৌথ মালিকানায় রাখতে বাধ্য হয়, তাহলে সে অংশীদারিত্বকে বলা হয় শিরকাতুল মিল্ক বিল জাবার বা বাধ্যতামূলক চুক্তিবিহীন অংশীদারিত্ব।

২. শিরকাতুল উকুদ ঃ কোন কারবারের অংশীদারগণ যখন স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে কোন কারবারে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং কারবারের লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেয়, তখন সেই কারবারকে বলা হয় চুক্তি-ভিত্তিক অংশীদারিত্ব বা শিরকাতুল উকুদ। প্রকৃতপক্ষে শিরকাতুল উকুদই হচ্ছে আসল অংশীদারী কারবার।

ইসলামী আইনশাস্ত্রে চার প্রকার অংশীদারী কারবারের উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(ক) শিরকাতুল মুফাবাদাহ; (খ) শিরকাতুল ইনান; (গ) শিরকাতুল আবদান বা সানাই এবং (ঘ) শিরকাতুল উজুহ্।

নিম্নের চিত্রে শিরকতের শ্রেণী বিন্যাস দেখানো হলো।[৩]

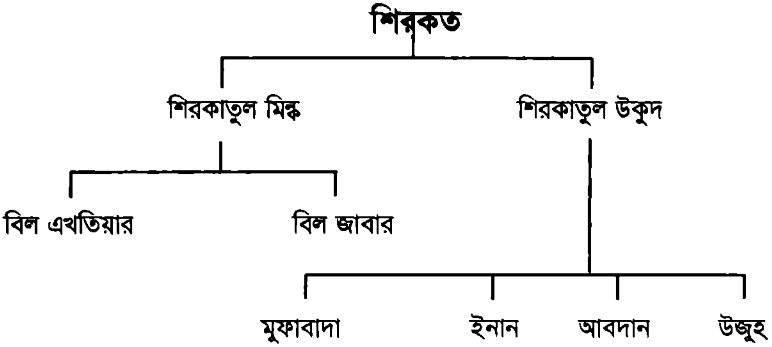

(ক) শিরকাতুল মুফাবাদাহ ঃ কোন মুশারাকাহ কারবারের অংশীদারগণ যখন সকলেই পূর্ণবয়স্ক হয়, প্রত্যেকেই সমপরিমাণ পুঁজি যোগান দেয়, ব্যবস্থাপনায় সমভাবে অংশগ্রহণ করে এবং লাভ-লোকসানে সমান অংশীদার হয়, তখন সেই মুশারাকাহ কারবারকে বলা হয় শিরকাতুল মুফাবাদাহ। এ ধরনের মুশারাকাহ কারবারে অংশীদারগণ পরস্পর পরস্পরের এবং প্রত্যেকে অন্য সকলের আমানতদার (Trustee) ও প্রতিনিধি (Agent) বা উকিল হিসেবে কাজ করে। এরূপ কারবারে অংশীদারগণ তৃতীয় পক্ষের নিকট ব্যক্তিভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী থাকে।[৪]

(খ) শিরকাতুল ইনান ঃ শিরকাতুল ইনানকে আসলে শিরকাতুল মুফাবাদাহর বিপরীত বলা যায়। শিরকাতুল ইনানে অংশীদারদের সকলেরই পূর্ণবয়স্ক হওয়া জরুরী

www.pathagar.com

নয়; এছাড়া এরূপ কারবারে অংশীদারদের পুঁজি ও লাভের অংশ সমান সমান হওয়ার শর্তও থাকে না। মোটকথা, অংশীদারগণ যখন কারবারে অসমান পুঁজি যোগান দেয়, কারবার ব্যবস্থাপনায় অসমভাবে অংশ নেয় এবং লাভে অসমান অংশগ্রহণ করে, তখন সে কারবারকে বলা হয় শিরকতে ইনান। তবে কারবারে লোকসান হলে প্রত্যেক অংশীদারকে তার পুঁজির অনুপাতে লোকসানের বোঝা বহন করতে হয়। শিরকাতুল ইনান কারবারে অংশীদারদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের এবং একে অপরের সকলের প্রতিনিধি, কিন্তু জামিনদার (Swaty) নন। সুতরাং এ কারবারে তৃতীয় পক্ষের নিকট অংশীদারদের দায়িত্ব ব্যক্তিগত-যৌথ নয়।[৫]

(গ) শিরকাতুল আবদান বা সানাই ঃ শিরকাতুল আবদানে অংশীদারগণ কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ করে না; বরং তাদের দক্ষতা ও শ্রমের ভিত্তিতে কারবারে অংশ নেয়। উদাহরণস্বরূপ, দু'জন সূত্রধর এবং দু'জন কর্মকার যদি এই শর্তে অংশীদারী কারবার শুরু করে যে তারা নিজ নিজ পেশার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের নিকট থেকে কার্যাদেশ গ্রহণ করবে এবং কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় সকলে ভাগ করে নেবে, তাহলে সে কারবারই হবে শিরকতে আবদান বা সানাই।

(ঘ) শিরকাতুল উজুহ্ ঃ যখন অংশীদারগণ কেবলমাত্র বাকীতে পণ্য ক্রয় করে এবং তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জন এবং তা ভাগাভাগি করার শর্তে কারবার শুরু করে, তখন সে কারবারকে বলা হয় শিরকাতুল উজুহ্। এ ধরনের কারবারে অংশীদারদের সুনাম, সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তাদের পুঁজি হিসেবে কাজ করে।

মুশারাকাহ্ কারবারের শর্তাবলী

উল্লেখিত চার ধরনের চুক্তির ভিত্তিতে বর্তমানকালে ব্যাপকভাবে মুশারাকাহ্ কারবার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। তবে এ চার রকম মুশারাকাহর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বত্র প্রচলিত মুশারাকাহ হচ্ছে শিরকতে ইনান। সকল মযহাবে এ ধরনের মুশারাকাহ কারবারকে বৈধ বলা হয়েছে।[৬] নিম্নে মুশারাকাহ্ কারবারের যে শর্তাবলী উল্লেখ করা হলো তা শিরকতে ইনানের সাথে সম্পর্কিত।

চুক্তি

মুশারাকাহ্ কারবার শুরু করার পূর্বেই অংশীদারদের মধ্যে এ সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। আল-কুরআনের নির্দেশ অনুসরণে চুক্তি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। চুক্তিপত্রে প্রত্যেক অংশীদারের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ, মুনাফার অংশ এবং কারবারের অন্যান্য যাবতীয় শর্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

লাভ-লোকসান বন্টন

মুনাফার অংশ নির্ধারণ ঃ চুক্তিপত্রে প্রত্যেক অংশীদার মুনাফার কত অংশ পাবে, তা অনুপাত হিসেবে বা মুনাফার শতকরা হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন অংশীদারকে নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা শর্ত করা যাবে না।[৭] মুনাফার অংশ নির্ধারণকালে প্রত্যেক অংশীদারকে তার পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফা দিতে হবে-শরীয়তে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই; বরং অংশীদারদের পুঁজি, দক্ষতা, গুরুত্ব ও অবদান ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে পুঁজির আনুপাতিক হারে, অনুপাত অপেক্ষা অধিক হারে অথবা অনুপাতের চেয়ে কম হারে মুনাফার অংশ নির্ধারণ করা যেতে পারে।[৮] বস্তুতঃ হানাফী ও হাম্বেলী মযহাবের মধ্যে মুশারাকাহ কারবারে অংশীদারদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রত্যেকের মুনাফার অংশ নির্ধারণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে।[৯]

লোকসান বহন ঃ মুশারাকাহ কারবারে কোন অংশীদারের মুনাফার অংশ তার পুঁজির অনুপাতে না হলে দোষ নেই; কিন্তু লোকসানের অংশ অবশ্যই পুঁজির অনুপাত অনুযায়ী হতে হবে। এটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কোন অংশীদারকে যদি তার পুঁজির অনুপাতের চেয়ে অধিক বা কম লোকসানের অংশ দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে চুক্তি অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে।[১০]

লাভ-লোকসান নিরূপণ ও বন্টন ঃ মুশারাকাহ কারবারে সর্বদাই নীট মুনাফা বা নীট লোকসান বন্টন করতে হবে। কারবার সমাপ্তির পর চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ করে অংশীদারদের সাকুল্য পুঁজি পৃথক করার পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে সেই উদ্বৃত্ত কারবারের নীট লাভ হিসেবে গণ্য হবে এবং পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাত অনুযায়ী তা অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। আর যদি দেখা যায় যে পুঁজিতে ঘাটতি হয়েছে, তাহলে সে ঘাটতিই হবে নীট লোকসান। এই নীট লোকসান অংশীদারদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ পুঁজির অনুপাতে বন্টন করতে হবে।

হিসাব চূড়ান্তকরণ এবং চূড়ান্ত লাভ-লোকসান নিরূপণের পূর্বে কোন অংশীদার কারবার থেকে যদি কোন মুনাফা গ্রহণ করে, তাহলে তা অগ্রিম হিসেবে গণ্য হবে এবং চূড়ান্ত হিসাব-কালে প্রাপ্য মুনাফার সাথে এর সমন্বয় করতে হবে।

অংশীদারদের পুঁজি প্রত্যর্পণ

মুশারাকাহ কারবার সমাপ্ত করার সময় কারবারের যাবতীয় মূলধন সামগ্রীসহ অন্যান্য সকল পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করে প্রথমে অংশীদারদের সাকুল্য পুঁজি প্রত্যর্পণ বা হস্তান্তরের জন্য পৃথক করে রাখতে হবে। অংশীদারদের মূল পুঁজি পূরণ না করে অথবা মূল পুঁজিতে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও অংশীদারদের কোন মুনাফা দেওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

মুশারাকাহ্ কারবারে প্রত্যেক অংশীদার অপর প্রত্যেকের এবং যৌথভাবে সকল অংশীদার অপর সকলের আমানতদার ও প্রতিনিধি। সুতরাং নীতিগতভাবে মুশারাকাহ্ কারবারে সকল অংশীদারকে কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোন অংশীদারের এ অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করা যাবে না। তবে প্রত্যেক অংশীদারকে বাস্তব কাজে অংশ নিতেই হবে-এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোন অংশীদার ইচ্ছা করলে কারবার ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরতও থাকতে পারে।[১১]

অংশীদারী কারবারে অংশীদারের সংখ্যা কম হলে তারা নিজেদের মধ্যে কারবারের বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে কারবার চালাতে পারে; অংশীদারের সংখ্যা বেশী হলে তারা পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে এক বা একাধিক অংশীদারকে কারবার চালানোর দায়িত্ব দিতে পারে; অথবা কারবারের মুনাফার অংশ প্রদানের শর্তে বা নির্ধারিত বেতন-ভাতার বিনিময়ে লোক নিয়োগ করেও কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে।

স্বাভাবিক কাজ ও লেনদেন

মুশারাকাহ্ কারবারে দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীদার বা অংশীদারগণ অন্যান্য অংশীদারের প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবে কারবার পরিচালনা করে। তারা কারবারের যাবতীয় স্বাভাবিক লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। কারবারের জন্য জায়গা-জমি ও দালান-কোঠা ক্রয় বা ভাড়া করা, যানবাহন সংগ্রহ, শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন, কাঁচামাল ক্রয়, ব্যবসায়ের মালামাল ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কাজ ছাড়া কোন কারবারের কথা ভাবা যায় না। সুতরাং অংশীদারী কারবারে যে কোন দায়িত্বশীল অংশীদার এসব লেনদেন করতে পারে এবং কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয় কারবার থেকে বহন করতে পারে। তবে মুশারাকাহ্ কারবারের কোন অংশীদার তার নিজস্ব কোন খরচ কারবার থেকে বহন করতে পারে না। কিন্তু কারবার ব্যাপদেশে অংশীদারের যাতায়াত, খাওয়া-থাকা ইত্যাদি খরচও কারবার থেকে বহন করা যাবে।

অংশীদারকে কাজের বিনিময়ে বেতন-ভাতা প্রদান

সকল মযহাবের ফক্বীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত, মুশারাকাহ্ কারবারের কোন অংশীদারকে তার কাজের বিনিময়ে নির্ধারিত বেতন, ভাতা বা পারিশ্রমিক প্রদান করা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে কোন একজন ফক্বীহ্ও ইতিবাচক রায় দিয়েছেন বলে জানা নেই।[১২] এমনকি হানাফী মযহাবের ইমাম যুফার (রঃ) সহ শাফেয়ী ও মালেকী মযহাবের ফক্বীহ্গণ অংশীদারকে নির্ধারিত বেতন-ভাতা দেওয়া তো দূরের কথা মুনাফার অতিরিক্ত অংশ প্রদান

www.pathagar.com

করাও বৈধ নয় বলে রায় দিয়েছেন।[১৩] তবে হানাফী মযহাবের অন্যান্য ফক্বীহ্ এবং হাম্বেলী মযহাবের সকল ফক্বীহ মুশারাকাহ কারবারের অংশীদার–আমেলকে (কর্মচারী) তার কাজের জন্য মুনাফার অতিরিক্ত অংশ প্রদান করা বৈধ বলে মত দিয়েছেন।[১৪]

বর্তমানকালের ফক্বীহ কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজের শরীয়া উপদেষ্টা বদর আল মুতাওয়াল্লী আব্দুল বাসেত পূর্ববর্তী ফক্বীহদের এতদসংক্রান্ত অভিমত পর্যালোচনা করে এবং আধুনিক মুশারাকাহ কারবারের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে ইতিবাচক রায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, " আমার মতে যিনি কারবারের অংশীদার এবং আমেল (কর্মচারী), তিনি পূর্ব–নির্ধারিত বেতন বা শতকরা হারে মুনাফার অংশ নিতে পারবেন।" [১৫] এ ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি বলেছেন যে পূর্ববর্তী ফক্বীহ্গণ কারবারের অংশীদারকে তার কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক বা নির্ধারিত বেতন প্রদানকে অবৈধ বলেছেন; এর কারণ হচ্ছে যে তাঁরা অংশীদারকে মুদারিবের সাথে তুলনা করেছেন, আর মুদারিবকে মুনাফার চুক্তিবদ্ধ অংশ ছাড়া কোন পারিশ্রমিক দেয়া বৈধ নয়। এছাড়া তাঁরা আধুনিক কালের ন্যায় কোম্পানীকে কৃত্রিম ব্যক্তি (Artificial Person) হিসেবে গণ্য করতেন না এবং বর্তমানকালে কোম্পানীগুলোর শেয়ার হস্তান্তরের সংখ্যা এত অধিক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পূর্ববর্তী ফক্বীহগণ তা ধারণাও করতে পারেননি। তিনি আরো বলেছেন যে কোম্পানীর কৃত্রিম ব্যক্তি হওয়ার বিষয়টি ইসলামী শরীয়তও স্বীকৃতি দেয় এবং এ প্রেক্ষিতে যিনি কারবারের অংশীদার এবং আমেল তার দু'টি হায়সিয়ত (মর্যাদা) হয়। প্রথমতঃ, তিনি কারবারের অংশীদার এবং এ হিসেবে তিনি কারবারের লাভ–লোকসানে ভাগী হবেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি একজন আমেল বা বেতনভুক্ত ব্যক্তি এবং এ হিসেবে তিনি চুক্তি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবেন, বিশেষতঃ অংশীদারদের সাধারণ সভায় যদি তাঁর নির্ধারিত বা অনির্ধারিত বেতনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়।[১৬]

এছাড়া মুদারাবাহ কারবারে মুদারিবের সাথে মুশারাকাহ্ কারবারের অংশীদারকে এক করে দেখাও যুক্তিসম্মত নয়; মুদারিব তার শ্রম ও দক্ষতার বলেই কারবারে অংশীদার হয়; এক্ষেত্রে পরিশ্রমের বিনিময়ে আবার বেতন–ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু মুশারাকাহ কারবারে যে অংশীদার পুঁজির যোগান দিয়ে অংশীদার হয়, তার ব্যাপারটি মুদারিবের মত নয়। মোটকথা, এ বিষয়ে আরো গবেষণা হওয়া দরকার।

মুশারাকাহ ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ

মুশারাকাহ্ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তৃতীয় পক্ষের সাথে মুশারাকাহ চুক্তির ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করার অর্থ হচ্ছে, মূল কারবারে নতুন অংশীদার যোগ করা। শরীয়তের শর্ত অনুসারে এরূপ অংশীদারকে মূল কারবারের মালিকানা প্রদান এবং কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া অপরিহার্য। এছাড়া শরীয়তের অন্যান্য শর্ত পালন–সাপেক্ষে

www.pathagar.com

নতুন অংশীদার গ্রহণের এখতিয়ার মূল অংশীদারদের রয়েছে ; তবে এজন্য সকল অংশীদারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা জরুরী।[১৭]

মুদারাবাহ ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ

অংশীদারদের সম্মতিক্রমে মুশারাকাহ্ কারবারের জন্য তৃতীয় পক্ষের এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট-থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এরূপ ক্ষেত্রে মুশারাকাহ্ প্রতিষ্ঠান হবে মুদারিব এবং চুক্তিবদ্ধ অর্থ যোগানদাতা হবে সাহিব আল–মাল। মুদারাবাহ চুক্তিতে সংগৃহীত অর্থ খাটিয়ে মুদারিব যে লাভ করবে, তা প্রথমে চুক্তিতে নির্ধারিত শর্ত অনুসারে সাহিব আল–মাল ও মুদারিবের মধ্যে বন্টন করতে হবে। অতঃপর মুদারিব হিসেবে মুশারাকাহ প্রতিষ্ঠান লাভের যে অংশ পাবে, তা মুশারাকাহ চুক্তিবদ্ধ অংশীদারদের মধ্যে পূর্ব–নির্ধারিত হারে বন্টন করতে হবে।[১৮]

মুশারাকাহ তহবিল ভিন্ন মুশারাকাহ চুক্তিতে বিনিয়োগ

মুশারাকাহ চুক্তির ভিত্তিতে সংগৃহীত অর্থ মুশারাকাহ চুক্তির ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষকে যোগান দেওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ফক্বীহ্ এ মত দিয়েছেন যে সকল অংশীদারের সম্মতি ছাড়া মুশারাকাহ তহবিল আবার মুশারাকাহ ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা যাবে না। মালেকী মযহাবের ফক্বীহগণ অবশ্য অন্যান্য অংশীদারদের অনুমতি ছাড়াই কতিপয় শর্তসাপেক্ষে এরূপ বিনিয়োগ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।[১৯] যাই হোক, অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ এড়ানোর লক্ষ্যে এবং মুশারাকাহ কারবারের স্বার্থরক্ষার্থে মুশারাকাহ তহবিল অপর মুশারাকাহ চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার পূর্বে অংশীদারদের কাছ থেকে সাধারণ অনুমতি অথবা প্রত্যেক প্রস্তাবের জন্য পৃথক পৃথক অনুমতি গ্রহণ করা যেতে পারে।[২০] মুশারাকাহ কারবারের অর্থ মুশারাকাহ চুক্তিতে বিনিয়োগ করা হলে চুক্তি অনুসারে এ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা মূল মুশারাকাহ কারবারের মুনাফারূপে গণ্য হবে এবং এতে লোকসান হলে তাও মূল কারবারের লোকসান হবে।[২১]

মুশারাকাহ তহবিল মুদারাবাহ চুক্তিতে বিনিয়োগ

অংশীদারদের সাধারণ সম্মতি বা বিশেষ সম্মতির ভিত্তিতে মুশারাকাহ কারবারের অর্থ মুদারাবাহ চুক্তিতে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।[২২]

অংশীদারের নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ

সাধারণভাবে অংশীদারদের মধ্যে বিরোধ এড়ানোর জন্য মুশারাকাহ কারবার থেকে অংশীদারের ব্যক্তিগত কারবারকে পৃথক রাখাই উত্তম। তবে কখনো কখনো পৃথক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে অথবা উভয় কারবার একত্রে করা হলে খরচ কম ও মুনাফা বেশী হয়;

www.pathagar.com

এসব কারণে অংশীদারদের অনুমতি সাপেক্ষে মুশারাকাহ্ কারবারের সাথে অংশীদারের ব্যক্তিগত পুঁজি ও কারবার একত্রিত করার সুযোগ থাকা উচিত। কাসানি ও ইবনে কুদামা এ মত সমর্থন করেছেন।[২৩]

ঋণ গ্রহণ ও ঋণ দান

অন্যান্য অংশীদারদের সুস্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া মুশারাকাহ কারবারের জন্য ঋণ গ্রহণ বা কারবারের তহবিল থেকে অন্যকে ঋণ দেওয়ার অধিকার কোন অংশীদারের নেই। এখানে সেই একই যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যা মুদারাবাহর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যেহেতু মুশারাকাহ কারবারে প্রত্যেক অংশীদার অপর অংশীদারদের প্রতিনিধি, সুতরাং অংশীদারদের অনুমোদন থাকলে যে কোন অংশীদার কারবারের জন্য ঋণ গ্রহণ ও কারবারের তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করতে পারে।[২৪]

ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ ও মুশারাকাহ কারবারে বিনিয়োগ

মুশারাকাহ কারবারের কোন অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে এবং নিজ দায়িত্বে ঋণ গ্রহণ এবং সে ঋণের অর্থ মুশারাকাহ কারবারে বিনিয়োগ করতে পারে কিনা–এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে এটি ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার; মুশারাকাহ্ চুক্তির কারণে তার এ অধিকার বিনষ্ট হতে পারে না।[২৫] কোন অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে এবং নিজ দায়িত্বে যে কোন পরিমাণ অর্থ ধার করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে অন্যান্য অংশীদারের সম্মতিক্রমে অংশীদারী কারবারে সে অর্থ বিনিয়োগও করতে পারে। তবে সে অর্থ সংশ্লিষ্ট অংশীদারের নিজস্ব পুঁজি হিসেবে গণ্য হবে এবং এ পুঁজি ও এর লাভ–লোকসানের জন্য সেই দায়ী হবে।[২৬]

বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়

যে কোন কারবারের জন্য ধারে ক্রয়–বিক্রয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধারে ক্রয়–বিক্রয় ব্যতীত কারবার সম্প্রসারণ করা কঠিন এবং এতে লাভও কমে আসে। এসব দিক বিবেচনা করে ফক্বীহগণ অংশীদারদের পূর্বানুমতি ছাড়াই ধারে মাল বিক্রয় করাকে অনুমোদন করেছেন।[২৭] তবে অংশীদারগণ চুক্তিকালে অথবা পরবর্তী সময়ে বাকীতে বিক্রয়ের উপর বাধা আরোপ করলে, সে অবস্থায় ধারে বিক্রয় করা যাবে না বলে তাঁরা রায় দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে মুশারাকাহ্ কারবারের দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীদার ধারে মাল ক্রয় করতে পারে বলেও ফক্বীহগণ মত প্রকাশ করেছেন। তবে ধারে ক্রীত মালের মূল্য কারবারের মোট পুঁজির অধিক হতে পারবে না। কোন অংশীদার যদি মোট পুঁজি অপেক্ষা অধিক মূল্যের মাল ক্রয় করতে চায়, তাহলে অন্যান্য অংশীদারদের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অংশীদারদের সুস্পষ্ট অনুমোদনক্রমে মোট পুঁজির অতিরিক্ত মূল্যের মাল ক্রয় করা হলে,

www.pathagar.com

সেই মাল কারবারের যৌথ মাল এবং এর মূল্য কারবারের যৌথ ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং এজন্য সকল অংশীদার যৌথভাবে দায়ী থাকবে।[২৮]

অংশীদারদের আর্থিক দায়

সাধারণভাবে মুশারাকাহ কারবারে কোন অংশীদারের আর্থিক দায় তার বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে অংশীদারদের অনুমোদনক্রমে ঋণ গ্রহণ করা হলে বা ধারে মাল ক্রয় করা হলে এই দায়ের সীমাও বেড়ে যাবে।[২৯]

মুশারাকাহ কারবারের সমাপ্তি

কোন নির্ধারিত মেয়াদের জন্য মুশারাকাহ চুক্তি করা হলে সেই মেয়াদ শেষে অংশীদারগণ যদি এ চুক্তি নবায়ন করার সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে সেই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যে কোন অংশীদার যে কোন সময়ে নোটিশ দিয়ে মুশারাকাহ চুক্তির অবসান ঘটাতে পারে। তবে দু'য়ের অধিক অংশীদার থাকলে অন্যান্য অংশীদারগণ কারবার চালিয়ে যেতে পারে। কোন অংশীদারের মৃত্যু হলেও মুশারাকাহ চুক্তি বাতিল হয়ে যায়; তবে অবশিষ্ট অংশীদারগণ কারবার চালু রাখতে পারে।[৩০]

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব

সুদী ব্যাংকগুলো দীর্ঘ কয়েকশ' বছর ধরে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বিশ্বের সকল দেশে সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এসব ব্যাংকের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করা হয়েছে। অপরদিকে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকের বয়স এখনো চার দশক পূর্ণ হয়নি। তদুপরি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক এখনো সুদী ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। অবশ্য অতি সম্প্রতি ইরান, পাকিস্তান, সুদান ও মালয়েশিয়ায় গোটা ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ উত্তরণ পূর্ণতায় পৌঁছেছে-সে কথা এখনো বলা যায় না। এ সত্ত্বেও তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকেই সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা উন্নততর, কল্যাণমুখী ও শ্রেষ্ঠতর বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অর্জনে সফলতা, কার্য-প্রণালী ও ফলাফলের দিক থেকে উভয় ব্যাংক ব্যবস্থার তুলনা করলে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে

আমানত গ্রহণ এবং আমানতী অর্থ খাটানো-এ দু'টিই হচ্ছে ব্যাংকের প্রধান কাজ। ইসলামী ব্যাংক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে এবং অংশীদারীর শর্তে বিনিয়োগকারীদের মূলধন যোগান দেয়। অর্থনৈতিক অবস্থার গতি-প্রকৃতি তথা অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠা-নামার (Fluctuation) সাথে বিনিয়োগকারীগণ বেশী লাভ অর্জন করলে ব্যাংকের লাভ বেড়ে যায় এবং আমানতকারীগণও অধিক হারে লাভ পায়; কিন্তু বিনিয়োগকারীদের লোকসান হলে ব্যাংক সে লোকসানের আনুপাতিক অংশ বহন করে এবং আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে তা বন্টন করে দেয়। এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও আমানতকারী সকলের আয়ই পরিবর্তনশীল ও নমনীয়। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করে আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীর অংশীদার হিসেবে অর্থনৈতিক কাজ-কারবারে সক্রিয় (Active) ও নমনীয় (Flexible) ভূমিকা পালন করে।[১]

অপরদিকে সুদী ব্যাংকের কর্ম-পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যায়, এ ব্যাংক আমানতকারীদের নির্ধারিত হারে সুদ দেয় এবং ঋণ-গ্রহীতাদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারে সুদ নেয়। অর্থনৈতিক ওঠা-নামা (Fluctuation) এবং ঋণ-গ্রহীতার প্রকৃত আয়ের সাথে

www.pathagar.com

ব্যাংকের গৃহীত সুদের যেমন কোন সামঞ্জস্য থাকে না, তেমনই আমানতকারীদেরকে প্রদত্ত সুদের হারের সাথে ব্যাংকের লাভ–ক্ষতির কোন সংগতি থাকে না। সকল অবস্থাতেই নির্ধারিত সুদের হার অপরিবর্তনশীল এবং অনমনীয়। এছাড়া সুদী ব্যবস্থায় ঋণ–গ্রহীতার কারবার এবং লাভ–লোকসানে ব্যাংকের যেমন কোন আগ্রহ থাকে না, তেমনি ব্যাংকের লাভ–ক্ষতিতে আমানতকারীদেরও কিছু যায়–আসে না। সুতরাং এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, সুদী ব্যাংকের কার্যক্রম অর্থনৈতিক গতি–প্রকৃতি তথা ওঠা–নামার (Fluctuation) সাথে সামঞ্জস্যহীন ও অনমনীয় (Inflexible) এবং অর্থনীতিতে এ ব্যাংক নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এজন্য সুদী ব্যাংককে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ না বলে একে পরজীবী (Parasite) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২]

ঋণের বাজার (Loan Market) বিলুপ্ত হয়

সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থকেও একটি পণ্য এবং সুদের হারকে অর্থের দাম মনে করা হয়। অতঃপর মুদ্রা–বাজার (Money Market) বা ঋণ–বাজারে (Loan Market) সুদের বিনিময়ে অর্থ বা ঋণের কেনা–বেচা করা হয়। বাজারে সুদের হার বাড়লে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায় এবং ঋণযোগ্য (Loanable Fund) তহবিলের যোগান বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে সুদের হার কমলে ঋণের চাহিদা বাড়ে এবং ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান হ্রাস পায়। এভাবে যে সুদের হারে ঋণের চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান সমান হয়, সে সুদের হারকে বলা হয় ভারসাম্য বা নির্ধারিত সুদের হার। এই নির্ধারিত হারে সুদ প্রদানে সক্ষম ঋণ– গ্রহীতাদেরই ঋণ দেওয়া হয় এবং যারা এ হারে সুদ প্রদানে অক্ষম, তারা ঋণ পায় না। এভাবে সুদের হার ঋণের অসীম চাহিদা এবং সসীম যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদকে সম্পূর্ণ রহিত করা হয় এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণ বেচা– কেনার পরিবর্তে মুনাফার ভিত্তিতে পণ্য–সামগ্রী ক্রয়–বিক্রয় এবং মুনাফার অংশের (Share in Profit) ভিত্তিতে কায়–কারবারে আর্থিক পুঁজি (Money Capital) যোগান দেওয়া হয়।

এই ব্যবস্থায় অর্থ বা ঋণের বাজার বিলুপ্ত হয়[৩] এবং গোটা বাজার পুঁজি বাজারে (Capital Market) পরিণত হয়। এতে ইসলামী ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে মুনাফার অংশ দেওয়ার শর্তে মুদারাবাহ আমানত গ্রহণ করে এবং মুনাফায় অংশ নেওয়ার শর্তে মুদারাবাহ বা মুশারাকাহ ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের পুঁজি যোগান দেয়।

বস্তুতঃ আমানতকারী ব্যাংকের কাছ থেকে এবং ব্যাংক বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে যে হারে মুনাফা গ্রহণ করে, তা আমানতকারী ও ব্যাংকের জমা ও আসলের উপর নির্ধারিত হার নয় ; বরং অর্জিত মুনাফার অনুপাত মাত্র। একটি হচ্ছে আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যে

www.pathagar.com

নির্ধারিত অনুপাত ; আর একটি হচ্ছে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত। সুবিধার জন্য এই উভয় অনুপাতকেই লাভের শতকরা অংশ অর্থাৎ ব্যাংকের লাভের (মূলধনের নয়) শতকরা 'এত ভাগ ব্যাংক পাবে' হিসেবে প্রকাশ করা হয়।[৪] আমানত গ্রহণ এবং বিনিয়োগ বরাদ্দের সময়ে প্রকৃত মুনাফা কত তা আমানতকারী, ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী কারোরই জানা থাকে না। তাই সম্ভাব্য মুনাফার (Expected Rate of Return) ভিত্তিতেই উদ্যোক্তা ও ব্যাংক এবং ব্যাংক ও আমানতকারীর মুনাফার অনুপাত স্থির করা হয়। অবশ্য বিনিয়োগ-যোগ্য তহবিলের চাহিদা এবং যোগানের মাধ্যমে এ উভয় হার নিরূপিত হয়।[৫]

অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে ব্যাংকের মুনাফার হার কমানো হলে অংশীদারী পুঁজির চাহিদা বেড়ে যায় এবং যোগান হ্রাস পায়; বিপরীতক্রমে ব্যাংকের মুনাফার হার বাড়লে অংশীদারী পুঁজির চাহিদা হ্রাস পায় এবং যোগান বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকের মুনাফা-হারের যে স্তরে অংশীদারী পুঁজির চাহিদা ও যোগান সমান হয়, সেখানে ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং এই অনুপাতে বিনিয়োগ বরাদ্দ দেওয়া হয়। অংশীদারী পুঁজির চাহিদা ও যোগান পরিবর্তন হলে নতুন অনুপাত নির্ধারিত হয়।

অনুরূপভাবে অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে যদি আমানতকারীর মুনাফার হার হ্রাস পায়, তাহলে মুদারাবাহ আমানতের চাহিদা বাড়ে এবং যোগান হ্রাস পায়; বিপরীতক্রমে যদি আমানতকারীর মুনাফার হার বাড়ে, তাহলে মুদারাবাহ আমানতের চাহিদা হ্রাস পায়। এভাবে আমানতকারীর মুনাফা-হারের যে স্তরে মুদারাবাহ আমানতের চাহিদা ও যোগান সমান হয়, সেখানে ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং এই অনুপাতে মুনাফা দেওয়ার শর্তে ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে। এরূপ আমানতের চাহিদা ও যোগান পরিবর্তন হলে মুনাফার নতুন অনুপাত নির্ধারিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে সম্ভাব্য মুনাফার (Ex-ante) নির্ধারিত অনুপাত বিনিয়োগ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভূমিকা পালন করে। উৎপাদনশীলতার বিচারে যে সব বিনিয়োগকারী নির্ধারিত অনুপাতে মুনাফা দিতে সক্ষম বিবেচিত হয়, তারা বিনিয়োগ-সুবিধা লাভ করে এবং যারা এ অনুপাতে মুনাফা দিতে ব্যর্থ হয়, তারা বিনিয়োগ পায় না। কিন্তু বাস্তবে কোন কারবারের প্রকৃত (Ex-post) মুনাফা যদি ক্রমাগতভাবে সম্ভাব্য মুনাফার চেয়ে কম হতে থাকে, তাহলে সে কারবারের জন্য ভবিষ্যতে পুঁজি সংগ্রহ করা কঠিন হবে অথবা আদৌ সম্ভব হবে না। অপরদিকে কোন কারবারের প্রকৃত মুনাফা যদি সম্ভাব্য মুনাফার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে সে কারবারের পক্ষে ভবিষ্যতে মূলধন যোগাড় করা সহজ হবে। বরং বলা যায়, যে কারবারে বিনিয়োগোত্তর মুনাফা যত বেশী হবে, সে কারবার তত বেশী বিনিয়োগ সুবিধা লাভ করবে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগোত্তর মুনাফা চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে।[৬]

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান লভ্যাংশের ভিত্তিতে অর্থায়ন করে। এছাড়া শেয়ার বাজারে যে কেউ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে।

মূলধনের ব্যয় শূন্য হয়

সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে গৃহীত আমানতের উপর নির্ধারিত হারে যে সুদ দেয় তা ব্যাংকের ব্যয়ের (Cost of Fund) অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যান্য ব্যয়ের সাথে এ সুদ পরিশোধ করার পর উদ্বৃত্ত আয় থাকলে ব্যাংকের লাভ হয়; আর উদ্বৃত্ত আয় না থাকলে বা আসল খোয়া গেলে ব্যাংকের লাভ হয় না বা লোকসান হয়।

অনুরূপভাবে ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের উপর ঋণ-গ্রহীতা নির্ধারিত হারে যে সুদ দেয়, তা পুঁজির ব্যয় (Cost of Fund) হিসেবে পণ্যের উৎপাদন খরচের অন্তর্ভুক্ত হয়। উৎপাদনকারী অন্যান্য ব্যয়ের সাথে সুদ পরিশোধ করার পর লাভ করতে পারে।

কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংক বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে যে আয় গ্রহণ করে তা বিনিয়োগকারীর উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে শামিল হয় না; বরং অন্যান্য উৎপাদন ব্যয় পরিশোধ করার পর যে উদ্বৃত্ত আয় থাকে, উৎপাদনকারী তারই নির্ধারিত অংশ ব্যাংককে দেয়। উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত বেশী হলে ব্যাংকের অংশের আয় বেশী হয়, কম হলে ব্যাংকও কম আয় পায়। আর যদি উদ্বৃত্ত নেতিবাচক হয়, তাহলে ব্যাংকের আয়ও নেতিবাচক হয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় পুঁজির ব্যয় শূন্য হয়।[৭]

ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক জনগণের কাছ থেকে গৃহীত আমানতের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হয়। ব্যাংক অন্যান্য খরচ বাদে উদ্বৃত্ত আয়ের অংশ জমাকারীদের প্রদান করে। সুতরাং ব্যাংকের গৃহীত আমানতের ব্যয়ও 'শূন্য' হয়।

সঞ্চয় ও পুঁজি-গঠনের গতি বৃদ্ধি পায়

সঞ্চয় থেকে পুঁজি গঠিত হয়; আর সঞ্চয় নির্ভর করে আয়ের উপর। সুদী ব্যবস্থায় সুদের হারের বাধার দরুন বিনিয়োগ ও উৎপাদন পূর্ণতার স্তরে পৌঁছতে পারে না বলে বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও আমানতকারী সকলেরই আয় সুদমুক্ত ব্যবস্থার তুলনায় কম হয়। এছাড়া সুদী ব্যাংক আমানতকারীদের যে সুদ দেয়, দ্রব্যমূল্য আকারে তার চেয়ে অধিক হারে সুদ আবার তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। দ্রব্যমূল্যের উপর সুদ প্রদান করায় ভোক্তা জনসাধারণের আয়ও হ্রাস পায়। সুদের হারের বিরূপ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়; অন্যদিকে সুদ মন্দা অবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থবিরতা সৃষ্টি ও বেকারত্ব বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির পথকে প্রায় রুদ্ধ করে দেয়। সুতরাং সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি শ্লথ ও মন্থর হয়ে আসে।

www.pathagar.com

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের অনুপস্থিতি এবং অংশীদারী ভিত্তিক অর্থায়নের ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি পায়; বেকার সমস্যা হ্রাস পায়; জনগণের আয় ও ক্রয়-ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে সুদী ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি বেশী হয়। ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তবায়ন এ গতিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।[৮]

ইসলাম বৈধ পথে আয়-উপার্জনকে যেমন উৎসাহিত করেছে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমনি মধ্যম পন্থা বা মিতব্যয়িতার পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে।[৯] এছাড়া বিলাসিতামূলক ব্যয়, অপচয় এবং অপব্যবহারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের এই নির্দেশ পালন করা হলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি অধিকতর দ্রুত হবে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিনিয়োগ বরাদ্দ দক্ষতাপূর্ণ হয়

সুদী ব্যবস্থায় সুদের হারকে ঋণের দাম (Price) গণ্য করা হয়। এ ব্যবস্থায় যে সব ঋণ-গ্রহীতা নির্ধারিত হারে সুদ দিতে পারে, তাদের ঋণ দেওয়া হয়; আর যারা সুদ দিতে ব্যর্থ হয়, তারা ঋণ পায় না। এভাবে বাজার উপাদান দ্বারা নির্ধারিত সুদের হার ঋণ বরাদ্দের নিরপেক্ষ মানদন্ড (Objective Criterion) হিসেবে কাজ করে এবং ঋণের অসীম প্রার্থীর মধ্য থেকে বাছাই করে সক্ষম ও দক্ষ প্রার্থীদের ঋণ বরাদ্দ করতে সাহায্য করে। ফলে ঋণের বরাদ্দ ও বিতরণ হয় বাঞ্ছিত পরিমাণ (Optimum) এবং দক্ষতাপূর্ণ। কিন্তু এই তত্ত্বের সাথে বাস্তব অবস্থার যথেষ্ট গড়মিল পরিলক্ষিত হয়।

বাস্তবে সুদী ব্যবস্থায় ঋণের উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা সুদসহ ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুদ ও ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার ভিত্তিতে অনুৎপাদনশীল ও ফটকামূলক খাতে ঋণ দিতে ব্যাংক দ্বিধা করে না। প্রকৃতপক্ষে সুদ অর্জনই মুখ্য; ঋণ-গ্রহীতা সুদ কোথা' থেকে পরিশোধ করলো, সুদী ব্যাংকের কাছে সে প্রশ্নের তেমন গুরুত্ব নেই। এ কারণে সুদী ব্যবস্থায় ভোগ্য ঋণ, বিলাসিতামূলক ঋণ, সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণ, যুদ্ধ-ঋণ ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে বিপুল পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়। সুতরাং সুদের ভিত্তিতে ঋণদান ব্যবস্থা একদিকে যেমন বৈষম্য সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে অনুৎপাদনশীল খাতে ঠেলে দেয়।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণ বরাদ্দের অদক্ষ ও বৈষম্যমূলক মানদন্ড সুদকে সম্পূর্ণ পরিহার করে বিনিয়োগ বরাদ্দের মানদন্ড হিসেবে মুনাফার অংশ বা অনুপাতকে (Share in Profit) গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অংশই হচ্ছে ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস; অন্যদিকে বিনিয়োগের লোকসানই হচ্ছে ব্যাংকের লোকসানের প্রধান কারণ।

www.pathagar.com

তাই সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদ পাওয়ার নিশ্চয়তা যেমন প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইসলামী ব্যবস্থায় তেমনি মুনাফার অংশ–প্রাপ্তি নিশ্চিত করাই হচ্ছে ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্প বা কারবারের উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনীনতাই আসল বিবেচ্য। কারবারে লাভ হলে পুঁজি ও লাভ ফেরত আপনা থেকেই নিশ্চিত হয়। অংশীদার হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ব্যাংকের অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তদারকীও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যথায় অংশীদারী কারবারে যদি সত্যিই লোকসান হয়, তাহলে লাভতো দূরের কথা, সাকুল্য মূলধন ফেরত নেওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। এ ব্যবস্থায় জামানত তেমন কাজে লাগে না। তবে বিনিয়োগকারীর বা অপর অংশীদারের গাফেলতি, ত্রুটি বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দরুন কারবারে লোকসান হলে ব্যাংকের পুঁজি ফেরত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জামানত গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে গভীরভাবে পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও যাচাই–বাছাইয়ের পর কারবার বা প্রকল্পের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর লাভ– জনীনতার ক্রমানুসারে কারবার ও প্রকল্পসমূহ সাজিয়ে নেওয়া হয় এবং সর্বোচ্চ লাভজনক কারবার থেকে শুরু করে ক্রমে নিম্ন থেকে নিম্নতর লাভজনক কারবারে মূলধন যোগান দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় অনুৎপাদনশীল ও অলাভজনক খাতে বিনিয়োগ বরাদ্দের কোন সুযোগ নেই। সুতরাং পুঁজি কেবল উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হয় এবং জাতীয় উৎপাদনকে বাঞ্ছিত স্তরে পৌছাতে সাহায্য করে। সুদী ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বরাদ্দ নিঃসন্দেহে অধিক দক্ষতাপূর্ণ ও উৎপাদনশীল হয়।

ঝুঁকি-বহুল বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়

সুদী ব্যবস্থায় কারবারে লোকসান ও সুদের সাকুল্য বোঝা একা বিনিয়োগকারীকে বহন করতে হয়। ফলে বিনিয়োগকারীগণ বড় বড় এবং ঝুঁকি–বহুল প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে সাহস পায় না। এসব বৃহৎ ও ঝুঁকি–বহুল প্রকল্পে একদিকে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় এবং লোকসানের আশঙ্কাও থাকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। সুদী ঋণের ভিত্তিতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হলে প্রতি বছর বিরাট সুদের বোঝা বহন করতে হয়। তাছাড়া এসব প্রকল্পের জন্য অবকাশ সময় (Gestation Period) লাগে প্রায় ২ থেকে ৫ বছর। এ দীর্ঘ সময়ে সুদের বোঝা বেড়ে এমন আকার ধারণ করে যে উৎপাদন লাভজনক হলেও সুদের এই বিরাট বোঝা বহন করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ঝুঁকি বেশী থাকায় কারবার যে কোন সময়ে লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে। এ অবস্থায় সুদে–আসলে ঋণের যে অংশ দাঁড়ায়, তা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং সুদী ব্যবস্থায় ঝুঁকি–বহুল কারবারে বিনিয়োগ হয় না বললেই চলে।

www.pathagar.com

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের একা সুদের বোঝা বহন করতে হয় না; বরং লোকসান হলে ব্যাংকও উদ্যোক্তার সাথে লোকসানের আনুপাতিক অংশ বহন করে। আর বিনিয়োগ যদি মুদারাবাহ ভিত্তিতে হয়, তাহলে আর্থিক লোকসানের সাকুল্য বোঝা ব্যাংকই বহন করে। ব্যাংকের দিক থেকে সুবিধা এই যে ব্যাংক এর যে কোন লোকসানের বোঝা একা বহন করে না, বরং অসংখ্য আমানতকারীর মধ্যে লোকসান বন্টন করে দেয়। ফলে এব্যবস্থায় লোকসান যত বড়ই হোক, বহুসংখ্যক লোক মিলে বহন করার কারণে প্রত্যেকের জন্য সে বোঝা হয় খুবই হালকা এবং সহনীয়। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি–বহুল বিনিয়োগ করায় সাহস বেশী থাকে এবং সুদী ব্যবস্থার তুলনায় এরূপ বিনিয়োগ বেশী হয়।

বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বেশী হয়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার তুলনায় বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বেশী হয়। ইতিপূর্বে সুদের প্রভাব আলোচনায় দেখানো হয়েছে, সুদের হার বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফার উপর বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা সেখানেই থেমে যায়। অতঃপর উদ্যোক্তা পুঁজি বিনিয়োগ করে না; কারণ আরো পুঁজি বিনিয়োগ করা হলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন–বিধির নিয়ম অনুযায়ী পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন সুদের হারের চেয়ে কমে যায় এবং পুঁজির বর্ধিত একক থেকে প্রাপ্ত আয়ের দ্বারা সেই এককের সুদ পরিশোধ করা সম্ভব হয় না, পূর্বে অর্জিত মুনাফা থেকে সুদ দিতে হয়। এতে উদ্যোক্তার মোট মুনাফা কমে যায়। সুতরাং উক্ত সুদের হারে ঋণের আর চাহিদা থাকে না। অপরদিকে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার সমান হওয়ার পর ব্যাংক যদি আরো ঋণ দিতে চায়, তাহলে ঋণের নতুন চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য সুদের হার হ্রাস করতে হয়; আর সে অবস্থায় ব্যাংকের মোট আয় কমে আসে। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থায় পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়; বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই স্তরকেই সর্বোচ্চ বিনিয়োগ, সর্বোচ্চ উৎপাদন ও সর্বাধিক মুনাফার স্তর বলা হয়। অবশ্য নির্ধারিত সুদের হারে এর চেয়ে অধিক বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা সম্ভব নয়।

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার হয় শূন্য। এই ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক আয় ইতিবাচক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা বাড়তে থাকে এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হলে মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে। এই সর্বোচ্চ মুনাফা পূর্ব–নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে উভয়ের মুনাফা হয় সর্বাধিক। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্যে পৌছার পূর্বে বিনিয়োগ বন্ধ করা হলে বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে না এবং

www.pathagar.com

ব্যাংকের প্রাপ্ত অংশও সর্বাধিক হয় না। অপরদিকে এই ব্যবস্থায় পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্যে পৌঁছার পর বিনিয়োগ আরো বাড়ানো হলে বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা কমে যায় এবং ব্যাংকের অংশও কমে আসে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পূর্ণ হয়, উৎপাদন হয় সর্বোচ্চ এবং মুনাফা হয় সর্বাধিক।

চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত ১ নং ছকের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি বুঝতে আরো সহজ হবে। এতে দেখানো হয়েছে যে, সুদের হার যদি ২০% হয়, তাহলে ৪র্থ এককে এসে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা সুদের হারের সমান হওয়ার ফলে বিনিয়োগ এখানেই থেমে যায়। এখানে মোট উৎপাদন হয় ১২৩.০০ টাকা। এই আয় থেকে ব্যাংক সুদ পায় ৮০.০০ টাকা এবং সুদ পরিশোধের পর বিনিয়োগকারী মোট মুনাফা পায় ৪৩.০০ টাকা। সুদের হার ২০% থাকা অবস্থায় বিনিয়োগ কমিয়ে বা বাড়িয়ে ৪৩.০০ টাকার চেয়ে বেশী মুনাফা পাওয়া সম্ভব নয় বলে সে আর বিনিয়োগ করবে না। সুতরাং এ ব্যবস্থায় এটিই হচ্ছে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ, সর্বাধিক উৎপাদন এবং সর্বোচ্চ মুনাফার স্তর।

কিন্তু সুদের হার শূন্য হলে বিনিয়োগ ৭ম এককে আসার পর পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হয় এবং এখানে বিনিয়োগকারীর সর্বোচ্চ মোট আয় হয় ১৩৮.০০ টাকা। ইসলামী ব্যবস্থায় এই বর্ধিত আয় ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে ৬০: ৪০ অনুপাতে ভাগ করা হলেও উভয়ের আয় সুদী ব্যবস্থার তুলনায় বেশী হয়। বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রচলিত সুদী ব্যবস্থার তুলনায় সুদমুক্ত অর্থনীতিতে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হয়।[১০]

বিনিয়োজিত পুঁজি আদায় সহজতর হয়

সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় কারবারের লাভ সুদের হারের চেয়ে বেশী হলে সুদসহ আসল পরিশোধ করা উদ্যোক্তার পক্ষে সহজ হয়; কিন্তু কারবারের আয় যদি সুদের হারের চেয়ে কম হয় অথবা যদি লোকসান হয়, তাহলে উদ্যোক্তার পক্ষে আসল ও সুদ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতঃপর এই অনাদায়ী ঋণের উপর ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ আরোপ করতে থাকে; ফলে আসল ঋণ ও সুদ মিলে ঋণের বোঝা এত ভারী হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তা দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়।

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদ থাকে না। এই ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীর লাভ হয় প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সুদ ও মুনাফার যোগফলের সমান।[১১] এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বরাদ্দের প্রধান মানদন্ড হচ্ছে কারবারের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতা। সুতরাং যতক্ষণ কারবারের উৎপাদনশীলতা ও লাভ বহাল থাকে, ততক্ষণ লাভের নির্ধারিত অংশসহ আসলের কিস্তি পরিশোধ করা বিনিয়োগকারীর পক্ষে অতি সহজ হয়। অতঃপর অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠানামার কারণে যদি কারবারে লোকসান হয়, তাহলেও কোন অসুবিধা হয় না; কারবার মুদারাবাহ ভিত্তিক হলে আর্থিক লোকসানের সাকুল্য বোঝা ব্যাংক

www.pathagar.com

বহন করে এবং বিনিয়োগকারীর অবস্থা পূর্বের তুলনায় কেবল এতটুকু খারাপ হয় যে কারবারে নিয়োজিত তার শ্রম ও সময় বৃথা যায়; এর অতিরিক্ত আর কিছুই তাকে হারাতে হয় না। কারবার যদি মুশারাকাহ্ ভিত্তিক হয়, তাহলে উদ্যোক্তাকে কেবল তার নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে লোকসান বহন করতে হয় এবং এর দায়িত্বও তার পুঁজির পরিমাণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে; এর অধিক বোঝা তার উপর কখনো চাপে না।

সূদী ব্যাংক ব্যবস্থায় কারবারের আভ্যন্তরীণ আয়–প্রবাহের (Cash flow) সাথে ব্যাংকের সুদ ও ঋণ পরিশোধ পদ্ধতির সংগতি নেই বলে উদ্যোক্তার পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা কঠিন হয় এবং কখনো কখনো সংকট সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে আমানতকারীদের সুদ প্রদানের সাথে ব্যাংকের আয়ের সামঞ্জস্য থাকে না বলে ব্যাংকও অনেক সময় সংকটে নিপতিত হয়।

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীকে তার কারবারের আভ্যন্তরীণ আয়–প্রবাহের (Cash flow) সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকের লাভ–লোকসান ও আসল পরিশোধ করতে হয় বলে তার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন সহজতর হয় এবং সংকট সৃষ্টির কোন আশংকা থাকে না।

বেকার সমস্যা হ্রাস পায়

সূদী ব্যবস্থায় বিনিয়োগ কম হয় বলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকে এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হয় না। সুদের হার যত বাড়ে, বিনিয়োগ তত হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব তত বেশী হয়। বস্তুতঃ সুদের হারের উপস্থিতিতে পূর্ণ বিনিয়োগ ও পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব নয়।

কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় সুদের হার শূন্য হয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ হয়। ফলে এই ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পূর্ণ হয় এবং কর্মসংস্থানও পূর্ণতা লাভ করে। শ্রমের চাহিদা ও মজুরীও বৃদ্ধি পায়।

সম্পদ ও আয়-বন্টন ইনসাফপূর্ণ হয়

সূদী ব্যাংক ব্যবস্থায় নির্ধারিত সুদের হারে ঋণ বরাদ্দ ও বন্টন করা হয়। বাস্তবে সুদের হার ঋণের স্বেচ্ছাচারী দামে (Parverted Price) পরিণত হয় এবং ধনিক শ্রেণীর পক্ষে মূল্য–বৈষম্য সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ বাজারব্যাপী একটিমাত্র ভারসাম্য সুদের হারের ধারণা নিছক একটি তাত্ত্বিক বিষয়। আসলে বাজারে বিভিন্ন সুদের হার বর্তমান থাকে; কখনো কখনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকও সুদের হারের পরিসীমা (Range) নির্ধারণ করে দেয়। ব্যাংকারগণ ঋণ বহনযোগ্যতা, জামানত দেওয়ার ক্ষমতা, প্রকল্পের আয়তন ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন ঋণ–গ্রহীতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে সুদ ধার্য করে থাকে। ব্যাংক সাধারণতঃ অধিক ঋণ–বহনযোগ্যতার কারণে বিত্তশালী এবং বড় বড় কারবারের মালিকদের

www.pathagar.com

অগ্রাধিকার দেয় এবং বিশেষ সুবিধাস্বরূপ নিম্নতর সুদের হারে অধিক ঋণ দেয়। এভাবে যারা বড় এবং বোঝা বহনের ক্ষমতা যাদের অধিক, তাদের উপর কম বোঝা দেওয়া হয়। অপরদিকে ঋণের একক প্রতি গড় উৎপাদন বেশী এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মাঝারি ও ছোট কারবারে উচ্চতর সুদের হারে স্বল্পতর ঋণ দেওয়া হয়। সুদী ব্যবস্থার এ বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে বড় বড় কারবারগুলো আরো বড় হওয়ার সুযোগ পায়; অপরদিকে মাঝারি ও ছোট কারবারগুলো প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে মৃত্যুবরণে বাধ্য হয়। মাঝারি ও ছোট কারবারগুলোর এ অবস্থায় ব্যাংক এদের সাহায্যে এগিয়ে আসা তো দূরের কথা , এদেরকে সামান্য অবকাশ দিতেও রাজী হয় না; বরং সংকটের সামান্য আভাস পাওয়া মাত্র এসব কারবার থেকে ব্যাংক তার পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয় এবং কারবারকে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেয়। অপরদিকে বড় কারবারে যদি কোন আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে এদের খেলাপী ঋণ নবায়ন করার সাথে সাথে অতিরিক্ত ঋণ সুবিধাও প্রদান করা হয়। সুতরাং সুদ সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টন ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য সৃষ্টি করে।

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রকল্প বা কারবারের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হয়। সুতরাং এ ব্যবস্থায় কারবার ছোট–বড় হওয়ার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা হয় না; বরং ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ সকল কারবারকে একই সমতলে এনে দাঁড় করানো হয় এবং যে কারবারে লাভের হার যত বেশী হয়, সে কারবার তত বেশী পুঁজি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বড় কারবার যদি সত্যিই অধিক উৎপাদনশীল ও লাভজনক হয়, তাহলে তার পুঁজি যোগানকারী প্রতিষ্ঠানকে কম নয়, বরং বেশী হারে মুনাফা দিতে হয়। অপরদিকে ছোট ও মাঝারি কারবার যদি সত্যিই উৎপাদনশীল হয়, তাহলে ঋণ বহন করার মত যথেষ্ট সম্পদ না থাকলেও বিনিয়োগ সুবিধা পেতে তাদের অসুবিধা হয় না। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টনে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম হয়। এছাড়া আয়–বন্টনের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যবস্থায় পূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুদী ব্যাংক আমানতকারীদের নির্ধারিত হারে সুদ দেয়। অতঃপর আমানতী অর্থ খাটিয়ে ব্যাংক বিপুল লাভ করলে আমানতকারীগণ সে বর্ধিত লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আবার ব্যাংকের লোকসান হলেও আমানতকারীদের নির্ধারিত সুদ দিতে হয়; এভাবে ব্যাংকের উপর জুলুম করা হয় এবং ব্যাংকের দায়ের বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে সুদী ব্যাংক ঋণ–গ্রহীতার কাছ থেকে নির্ধারিত হারে সুদ নেয়। ঋণ গ্রহীতা ঋণের অর্থ খাটিয়ে প্রচুর লাভ করলেও ব্যাংক বর্ধিত আয়ের অংশ থেকে বঞ্চিত থাকে, অপরদিকে ঋণ–গ্রহীতার লোকসান হলে, এমনকি তার পুঁজি সম্পূর্ণ খোয়া গেলেও ব্যাংকের নির্ধারিত সুদসহ আসল পরিশোধ করতে হয়। এতে ঋণ–গ্রহীতা জুলুমের শিকার হয়, কখনো কখনো দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এসব বঞ্চনা ও জুলুমের অবসান ঘটিয়ে আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করে। ইসলামী ব্যাংক বঞ্চনা ও জুলুমের প্রধান হাতিয়ার সুদকে বর্জন করে লাভ–লোকসানের অংশীদারিত্বকে আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি বানিয়ে নিয়েছে। এই ব্যবস্থায় ব্যাংক বিনিয়োগকারীর সাথে তার কারবারের লাভ–লোকসানে ভাগী হয়। কারবারে লাভ বেশী হলে উভয়ের লাভের অংক বড় হয়, লাভ কম হলে উভয়ে কম আয় পায়, আর লোকসান হলে উভয়ে পুঁজির অনুপাত অনুসারে তা বহন করে। অনুরূপভাবে আমানতকারীগণও ব্যাংকের আয়ের সাথে সংগতিশীল অংশ পায় এবং ব্যাংকের লোকসান হলে সকলে মিলে জমার অনুপাত অনুসারে তা ভাগ করে নেয়। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর সকলেই অংশীদার এবং মুনাফা হলে সকলেই লাভবান হয়, ক্ষতি হলে সকলে মিলে তা বহন করে। এ ব্যবস্থা পূর্ণ সুবিচার ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মুদ্রাস্ফীতি কমে আসে

সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদ এবং জামানতের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া হয়; ফলে পণ্য–সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহের সাথে প্রায়ই ঋণের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণ, ভোগ্য ঋণ, যুদ্ধ ঋণ ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যাপক ঋণ সরবরাহ করা হয়; বাজারে দ্রব্য–সামগ্রীর তুলনায় অর্থ সরবরাহ বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়–ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় হয় পণ্য–সামগ্রী ক্রয়–বিক্রয় করা হয় অথবা উৎপাদনশীল খাতে মূলধন যোগান দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং পণ্য–সামগ্রীর সাথে অসামঞ্জস্যশীল অর্থ সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হবার আশংকা তেমন থাকে না।

অর্থনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পায়

সুদী ব্যবস্থায় সুদের হার প্রতিনিয়ত ওঠানামা করে এবং গোটা অর্থনীতিকে মারাত্মক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার শিকার বানিয়ে রাখে। সুদের হার যখন নিম্ন থাকে, তখন সুদী ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীল খাতে ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী ফটকা কারবারের জন্য ঋণ দেয়; ঋণ–গ্রহীতারাও ফটকা কারবারকে অধিক লাভজনক মনে করে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে ফটকা কারবারে বেশী উৎসাহবোধ করে। এছাড়া নিম্ন সুদের হার বিলাসিতামূলক ও জাঁকজমকপূর্ণ ব্যয় বাড়িয়ে দেয় এবং

www.pathagar.com

মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে। এ ছাড়াও নিম্ন সুদের হার শ্রম-বিমুখ বিনিয়োগের মাধ্যমে বেকার সমস্যাকে তীব্রতর করে তোলে। অপরদিকে আর্থিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে যখন সুদের হার বৃদ্ধি করা হয়, তখন ফটকা কারবার ও বিলাসিতামূলক ব্যয় হ্রাস পায়; কিন্তু উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। উচ্চ হারে সুদ পরিশোধ করার পর কারবারে লাভ থাকে না বলে নতুন বিনিয়োগ বন্ধ হয় এবং আয়-প্রবাহ (Cash flow) সংকুচিত হওয়ার ফলে অনেক পুরাতন কারবার বন্ধ হয়ে যায়। বেকার সমস্যা আরো তীব্র হয়; ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা আরো হ্রাস পায়; অর্থনীতিতে দারুণ মন্দা দেখা দেয় এবং অর্থনীতি বিপর্যয়ে নিপতিত হয়।

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অংশীদারী ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হয় এবং কারবারে নীট ফলাফলই অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রচলিত নিয়ম-প্রথা, সুবিচার এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের মধ্যে মুনাফা বন্টনের হার নির্ধারণ করা হয় এবং এ হার সুদের হারের ন্যায় ঘন ঘন ওঠানামা করে না। এছাড়া সুদী ব্যবস্থায় কারবারে লাভ কিংবা লোকসান হোক, সর্বাবস্থাতেই নির্ধারিত সুদ পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় লভ্যাংশ কেবল লাভ হলেই দিতে হয়। সুতরাং সুদের তুলনায় অংশীদারী বিনিয়োগের বোঝা হালকা হয় এবং কারবারের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এ অবস্থা কারবার পতনের সংখ্যা হ্রাস করে এবং অর্থনীতিতে অস্থিরতা কমিয়ে আনে।

বস্তুতঃ লাভ-লোকসানে অংশীদারী ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা হ্রাস পায়, উৎপাদনশীল দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে পুঁজি প্রবাহিত হয় এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শৃংখলা স্থাপিত হয়।[১২]

প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়

সুদের হার বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বাধিক স্তরে পৌঁছতে দেয় না। এ ছাড়া অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। সর্বোপরি চাহিদা হ্রাস ও মন্দা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির গতিকে প্রায় রুদ্ধ করে দেয়।

কিন্তু সুদ বিলোপ করে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারী ভিত্তিতে অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু করা হলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, উদ্যোক্তা ও অর্থায়নকারীর মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি বন্টিত হয়। অর্থনীতিতে অস্থিরতা হ্রাস পায়, অনিশ্চয়তা দূর হয়। বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়।

আঘাত (Shock) মুকাবিলা সহজ হয়

সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংক জমাকারীদের নির্ধারিত সুদ দেয়; ব্যাংকের লোকসান হলে বা অর্থনৈতিক দুর্যোগজনিত কোন আঘাত (Moment shock) এলে ব্যাংককে জমাকারীদের

www.pathagar.com

আমানত ও সুদ পরিশোধ করতে হয়। ফলে ব্যাংকের লোকসানের বোঝা অত্যন্ত ভারী হয়ে ওঠে এবং ব্যাংকের প্রকৃত দেনা ও পাওনার মধ্যে চরম ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়, ব্যাংক ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয়। কিন্তু এ ভারসাম্যহীনতা দূর বা সমন্বয় করার কোন ব্যবস্থা সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় নেই; তাছাড়া এরূপ সংশোধন কত দিনে করা সম্ভব হবে তাও জানা থাকে না।[১৩]

এছাড়া সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণ–গ্রহীতা যদি যথার্থ ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাহলেও ব্যাংক অনাদায়ী ঋণের উপর নির্ধারিত হারে সুদ আরোপ করে এবং ঋণ–গ্রহীতার ঋণের বোঝা এত ভারী করে তোলে যে ঋণ–গ্রহীতা দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়।

অপরপক্ষে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানতকারীগণ ব্যাংকের অংশীদার হিসেবে লাভের নির্ধারিত অংশ গ্রহণ এবং পুঁজির আনুপাতিক হারে লোকসান বহনের চুক্তিতে ব্যাংককে মূলধন যোগান দেয়। সুতরাং ব্যাংকের উপর সংকট সৃষ্টিকারী কোন আঘাত (Shock) এলে ব্যাংক এর সাকুল্য লোকসান মুদারাবাহ্ জমাকারীদের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের জমার অনুপাতে ভাগ করে দেয় এবং জমার (শেয়ার) মূল্য হ্রাস করে পাওনা ও দেনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকের দেনা ও পাওনার প্রকৃত মূল্যের মধ্যে সর্বদাই ভারসাম্য বহাল থাকে।[১৪] বিষয়টি আরো সহজ করার জন্য নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ গ্রহণকারী কোন গ্রাহক যদি কারবারে লোকসান দেয়, এমনকি লোকসানের দরুন যদি তার সাকুল্য মূলধনও খোয়া যায়, তাহলেও উদ্যোক্তা ব্যাংক এবং আমানতকারীদের তেমন কোন অসুবিধা হয় না।

প্রথমে উদ্যোক্তার দিক থেকে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। উদ্যোক্তা যদি মুদারাবাহ্ চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগ সুবিধা নেয়, আর যদি তার কোন ত্রুটি, গাফেলতি ও চুক্তিভঙ্গের কারণে লোকসান না হয়, তাহলে উক্ত লোকসানের সম্পূর্ণ বোঝা ব্যাংকের উপর বর্তায়; উদ্যোক্তা কেবল তার ব্যয়িত শ্রম ও সময় হারায় এবং এর বেশী লোকসানের কোন আর্থিক বোঝা তাকে বহন করতে হয় না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় মুদারাবাহ্ বিনিয়োগকারী লোকসানের বোঝা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে, অর্থাৎ সুদী ব্যাংকের ন্যায় লোকসানের মাধ্যমে খোয়া যাওয়া ব্যাংকের পুঁজি তাকে ফেরত দিতে হয় না।

উদ্যোক্তা যদি মুশারাকাহ্ চুক্তির ভিত্তিতে মোট পুঁজির একটা অংশ নিজে যোগান দেয় এবং বাকী অংশ ব্যাংক থেকে গ্রহণ করে, তাহলে তার মূলধনের অনুপাতে লোকসানের একটা অংশ সেও নিজে বহন করে এবং বাকী অংশ ব্যাংকের উপর বর্তায়। এক্ষেত্রেও বিনিয়োগকারীর দায়িত্ব তার পুঁজির পরিমাণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। সুদী ব্যাংকের ন্যায় সাকুল্য লোকসান ও সুদের বোঝা তাকে বহন করতে হয় না।

জমাকারী ও ব্যাংকের দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, লোকসান বহন করা ব্যাংকের পক্ষেও তেমন কঠিন হয় না। কোন মুদারাবাহ্ অথবা মুশারাকাহ্ বিনিয়োগকারীর

www.pathagar.com

লোকসানের সম্পূর্ণ বা আংশিক বোঝা ব্যাংকের উপর আসার পর ব্যাংক এর অন্যান্য বিনিয়োগের উপর প্রাপ্ত মুনাফা থেকে উক্ত লোকসান পূরণ করে। অতঃপর ব্যাংকের কাছে যে মুনাফা অবশিষ্ট থাকে, তা থেকে আমানতকারীদের নির্ধারিত অংশ দেয় এবং বাকী অংশ ব্যাংক নেয় ও ডিভিডেন্ড হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করে দেয় (কর প্রদানের পর)। এখানে বড় জোর এতটুকু বলা যায় যে, কোন কোন বিনিয়োগে লোকসান না হলে লোকসানদাতা উদ্যোক্তা লাভের অংশ পেতো এবং ব্যাংক ও আমানতকারীদের লাভের অংশ আরো বড় হতো। উল্লেখ্য, তত্ত্বগত দিক থেকে ব্যাংকের লোকসান হলে আমানতকারীগণ সে লোকসানের বোঝা বহন করবে একথা ঠিক, কিন্তু বাস্তবে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্নমুখী হাজার হাজার প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। সকল প্রকল্পে একই সাথে লোকসান হওয়া কেবল অবাস্তবই নয়, অসম্ভবও।[১৫] প্রকৃতপক্ষে কতিপয় প্রকল্পে লোকসান হলেও অন্যান্য সকল প্রকল্পের লাভ থেকে লোকসান পূরণ করার পর সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের লাভ থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং বাস্তবে ব্যাংকের লোকসানের ফলে আমানতকারীদের আমানত হ্রাস পাওয়া বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা খুব কমই সৃষ্টি হবে।

তবু লাভ-লোকসান যোগ-বিয়োগ করার পর সামগ্রিকভাবে কখনো যদি ব্যাংকের লোকসান হয়ই, তাহলে সে লোকসান ব্যাংকের সকল মুদারাবাহ আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে প্রত্যেকের জমা মূলধনের আনুপাতিক হারে ভাগ করে দেয়া হবে। এভাবে হাজার হাজার জমাকারী ও শেয়ারহোল্ডার মিলে লোকসান ভাগ করে নেয়ার ফলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ হবে অতি সামান্য, যা বহন করা অতি সহজ হবে এবং এতে কেউ অচল হয়ে পড়বে না বা দেউলিয়া হবে না। ডঃ নেজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী এ কথাটাই ব্যক্ত করেছেন, "Profit sharing will be a safeguard against bankrupcies and bank failures which, in an interest based system, distribute these fluctuations in an irrational manner distorting both the distribution of income and the pattern of productive enterprize."[১৬]

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশে সুদমুক্ত এবং ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত প্রথম ব্যাংক হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে এই ব্যাংক ব্যাংকিং ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানী আইনের আওতায় নিবন্ধিত হয়, একই সালের ৩০ মার্চ এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার পর ১২ আগষ্টে এর প্রধান শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি বহুজাতিক ব্যাংক।

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মহান লক্ষ্যে এদেশের কিছুসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশে সৌদি আরবের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাবেক সহকারী মহাসচিব মরহুম শেখ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতিব, সৌদি আরবের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ আহমদ সালাহ জামজুম, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের চেয়ারম্যান শেখ আহমদ বা'জী আল-ইয়াসিন এবং রিয়াদের আল-রাজী কোম্পানীর শেখ সোলাইমান আল-রাজীর মতো আন্তর্জাতিক পরিচিতিসম্পন্ন মুসলিম মনীষীবৃন্দ। এ ছাড়া মুসলিম দেশসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েতের পাবলিক ইন্সটিটিউশন ফর সোশ্যাল সিকিউরিটি, কাতারের ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন, ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং, লুক্সেমবার্গ, জর্দান ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, কুয়েতের ডিপার্টমেন্ট অব মাইনরস এ্যাফেয়ার্স, কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব আওকাফ এন্ড ইসলামিক এ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো-এসব ইসলামী ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের মূলধনে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। ফলে এটি একটি অনন্য সাধারণ আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও আকাংখা বাস্তবায়িত হয়েছে। এ নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ায় প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা এবং আমাদের আকাংখিত ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের বাস্তব সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের সদর দফতর রাজধানী ঢাকার ৭১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত। ১৯৯৫ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৮৩-এ দাঁড়িয়েছে। এ বছরে ব্যাংক শহর ও গ্রামাঞ্চলে আরো ২০টি নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে শাখা সম্প্রসারণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন-এ উল্লেখিত ব্যাংকের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

- ❒ সুদমুক্ত এবং শরীয়ত মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ❒ ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ঋণদাতা-ঋণ-গ্রহীতা নয়, বরং অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা।
- ❒ অংশীদারী এবং ঝুঁকি-বহন ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা।
- ❒ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যাংক ও মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করা।
- ❒ কল্যাণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থনৈতিক কায়-কারবারের সকল পর্যায়ে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করা।
- ❒ বিশেষ করে পল্লী এলাকার দরিদ্র, অসহায় ও নিম্ন-আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সহযোগিতা করা।
- ❒ বেকার যুব-সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ❒ জনকল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং অনুরূপ কাজে সহায়তা দান করা;
- ❒ ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগীর ভূমিকা পালন করা।

বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সুদমুক্ত পন্থায় লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে সকল প্রকার ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এ ব্যাংক ইতোমধ্যেই দেশের বিরাট সংখ্যক সচেতন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাতে এবং তাদের মনে আশার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোই অন্যান্য প্রচলিত ধারার ব্যাংক থেকে এ ব্যাংককে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ

- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হয়।
- ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন স্থানীয় আলেম, আইনজীবী এবং অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শরীয়া কাউন্সিল ইসলামী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমের ইসলামী যথার্থতা সম্পর্কে পরামর্শ দান করে।
- এ ব্যাংকের সকল অর্থনৈতিক লেনদেন ও কার্যক্রম সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। এ ব্যাংক হালাল বিনিয়োগের ইসলামী বিকল্প হিসেবে কাজ করে।
- সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে এ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত ও গঠিত বোর্ড অব ডাইরেক্টরস–এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। বোর্ড অব ডাইরেক্টরস–এ ১৪ জন স্থানীয় এবং ৯ জন বিদেশী পরিচালক রয়েছেন। স্থানীয় ১৪ জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি। আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের বিধি অনুসারে ব্যাংকের পরিচালকগণ প্রতি বছর দেশী পরিচালকদের মধ্য থেকে একজন পরিচালককে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বা পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য নির্বাহী কমিটি নামে একটি উচ্চ–ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি রয়েছে। বর্তমানে নির্বাহী কমিটিতে ৭ জন সদস্য রয়েছেন; তাঁরা সকলেই পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত। এছাড়া ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে আরো একটি কমিটি রয়েছে। ব্যাংকের কার্যক্রম যথার্থভাবে শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে চলছে কিনা তা দেখা এবং ব্যাংককে শরয়ী ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেম, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ ও ব্যাংকারদের সমন্বয়ে একটি শরীয়া কাউন্সিল আছে।

মূলধন

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড–এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০.০০ কোটি টাকা। ১৯৮৩ সালে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ৬.৭৫ কোটি টাকা এবং ১৯৮৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ৭.১৫ কোটি টাকা। ১৯৮৫ সালে জনগণের মধ্যে শেয়ার

www.pathagar.com

ইস্যুর মাধ্যমে আরো ৮০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার পর পরিশোধিত মূলধন দাঁড়ায় ৭.৯৫ কোটি টাকা। অতঃপর ১৯৯০ সালে ৮.০০ কোটি টাকার রাইট শেয়ার ইস্যু করার ফলে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ১৬.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ব্যাংকের রিজার্ভ তহবিলও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩.৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৯৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর রিজার্ভ তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০.৩৬ কোটি টাকা।

কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সঞ্চয় সমাবেশ, বিনিয়োগ,আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থ হস্তান্তরসহ যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম ছাড়াও ইসলামী আদর্শের মহান লক্ষ্য হাসিলের জন্য নানাবিধ সমাজসেবামূলক কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। নিম্নে এসব কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

সঞ্চয় সমাবেশ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শরীয়তসম্মত পন্থায় এর গ্রাহকদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত হিসেবে আমানত গ্রহণ করে ঃ

১. আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব (Al-Wadeah Current Account) ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ন্যায় আল–ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাবে গ্রাহকদের আমানত গ্রহণ করে। ব্যাংকের এরূপ আমানত শরীয়তে বর্ণিত আল–ওয়াদিয়াহ নীতির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। ব্যাংক অনুরূপ জমার সম্পূর্ণ অর্থ জমাকারীদের ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদানের শর্তে এ অর্থ নিজ কারবারে ব্যবহার করার অনুমতি গ্রহণ করে। এ অর্থ খাটিয়ে ব্যাংক যা লাভ করে তার সম্পূর্ণটা ব্যাংকের থাকে। জমাকারীদের এর কোন অংশ দেয়া হয় না। চাহিবামাত্র আল–ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাবের অর্থ জমাকারীদের ফেরত দেওয়া হয়। এই হিসাব চেকের মাধ্যমে পরিচালনা করা যায়। অন্যান্য ব্যাংকের মত ইসলামী ব্যাংকও গ্রাহকদের আল–ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাবের মাধ্যমে চেক, বিল এবং অন্যান্য হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহ কালেকশন করে। এ হিসাবে অর্থ জমাদান ও উঠানোর উপর কোন প্রকার বিধি–নিষেধ থাকে না। যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সোসাইটির নামে এই হিসাব খোলা যায়।

২. মুদারাবাহ হিসাব (Mudarabah Account) ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দু'ধরনের মুদারাবাহ হিসাবে আমানত গ্রহণ করে। একটিকে বলা হয় মুদরাবাহ বিশেষ নোটিশ আমানত এবং অন্যটি হচ্ছে মুদারাবাহ সঞ্চয়ী হিসাব।

www.pathagar.com

(ক) মুদারাবাহ বিশেষ নোটিশ আমানত (Mudarabah Special Notice Account) ঃ ব্যাংক মুদারাবাহ্ ভিত্তিতে এ আমানত গ্রহণ করে এবং যে কোন অংকের টাকা দিয়ে এ হিসাব খোলা যায়। ব্যাংকের মোট মুদারাবাহ্ আমানত খাটিয়ে ব্যাংক যে লাভ পায়, নির্ধারিত ওয়েটেজ অনুসারে তার অংশ এরূপ আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এই হিসাবের জমাকৃত অর্থ উঠাতে হলে ৭ দিনের আগাম নোটিশ দিতে হয়। অন্যান্য মুদারাবাহ আমানতের চেয়ে এই আমানতে মুনাফার হার সাধারণতঃ কম হয়। এরূপ হিসাব চেকের মাধ্যমে পরিচালনা করা যায়। মুদারাবাহ্ আমানত খাটিয়ে ব্যাংকের লোকসান হলে আমানতকারীগণ তাদের আমানতী অর্থের অনুপাতে লোকসানের অংশ বহন করে। প্রতিমাসে নিম্নতম যে অর্থ হিসাবে জমা থাকে, তার ভিত্তিতে লাভ-লোকসান হিসাব করা হয়। জমাকারী হিসাবের শর্ত ভঙ্গ করলে লাভ দেওয়া হয় না। হিসাবের উপর কোন আনুষঙ্গিক খরচ ব্যাংক নেয় না। তবে শর্ত ভঙ্গ করা হলে ব্যাংক আনুষঙ্গিক খরচ কর্তন করার এখতিয়ার রাখে।

(খ) মুদারাবাহ সঞ্চয়ী হিসাব (Mudarabah Savings Account) ঃ ব্যাংক মুদারাবাহ্ চুক্তির ভিত্তিতে মুদারাবাহ্ সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত গ্রহণ করে। যে কোন ব্যক্তি এককভাবে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে অথবা যে কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা প্রাথমিক জমা দিয়ে এরূপ হিসাব খুলতে পারে। প্রতিমাসে সর্বাধিক চার বার হিসাবে অবস্থিত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ অথবা একবারে সর্বাধিক ১৫০০০.০০ টাকার মধ্যে যেটি কম সেটি উঠানো যায়। এর চেয়ে বেশী অর্থ উঠাতে হলে সাত দিনের নোটিশ দিতে হয়।এসব শর্ত ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট মাসে জমাকারীকে তার হিসাবে রক্ষিত অর্থের উপর কোন মুনাফা দেয়া হয় না। এরূপ হিসাব চেকের মাধ্যমে পরিচালনা করা যায়। বিল, চেক বা অন্যান্য হস্তান্তরযোগ্য দলিল এ হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। জমাকারীর হিসাবে মাসে সর্বনিম্ন পরিমাণ যে অর্থ জমা থাকে, তার ভিত্তিতে লাভ-লোকসান হিসাব করা হয়। এরূপ জমার উপর প্রদত্ত লাভের হার লাভ-লোকসান অংশীদারী বিশেষ নোটিশ আমানতের চেয়ে বেশী হয়।

৩. মুদারাবাহ মেয়াদী হিসাব (Mudarabah Term Deposit Account)ঃ মুদারাবাহ্ মেয়াদী হিসাবে ব্যাংক মুদারাবাহ্ চুক্তির ভিত্তিতে ৬ মাস, ১ বছর, ২ বছর এবং ৩ বছর মেয়াদের জন্য আমানত গ্রহণ করে থাকে। কমপক্ষে ১০০০.০০ টাকা এবং ১০০ টাকার গুণিতক হিসেবে যে কোন পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে মেয়াদী হিসাব খোলা যায়। ব্যাংক এরূপ মেয়াদী আমানতের বেলায় চেকবই দেয় না, তবে জমার প্রমাণস্বরূপ জমাকারীকে রসিদ প্রদান করে। জমাকারী মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সাধারণতঃ জমার অর্থ তুলে নিতে পারে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ জমার অর্থ তুলে নেওয়ার অনুমতি

www.pathagar.com

দেওয়া হয়। জমা করার ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা তুলে নিলে সে জমার উপর ব্যাংক কোন লভ্যাংশ দেয় না; কিন্তু ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর, অথচ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা তুলে নিলে উক্ত জমার উপর সংশ্লিষ্ট সময়ে লাভ-লোকসান ভিত্তিতে মুদারাবাহ সঞ্চয়ী আমানতের লাভের হার অনুসারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ব্যাংকের নির্ধারিত ওয়েটেজ (Weightage) অনুসারে মুদারাবাহ সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় মুদারাবাহ মেয়াদী আমানতের উপর লাভের হার বেশী হয় এবং মেয়াদ যত দীর্ঘ হয়, লাভের হারও তত অধিক হয়। এরূপ আমানতের মুনাফা প্রতিবছর হিসাব করা হয়; কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হলে মুনাফা হিসাবে জমা করা হয়।

৪. মুদারাবাহ হজ্ব সঞ্চয়ী আমানত (Mudarabah Hajj Savings Account) ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এ দেশের হজ্ব করতে ইচ্ছুক লোকদের পবিত্র হজ্ব পালনের সুবিধার্থে মুদারাবাহ হজ্ব সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প চালু করেছে। ব্যাংক মুদারাবাহ নীতির ভিত্তিতে হজ্ব আমানত গ্রহণ করে। ১ থেকে ১০ বছরের মধ্যে হজ্ব করতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তি এ ধরনের হিসাবে নির্ধারিত মাসিক কিস্তিতে তার সঞ্চয় জমা করতে পারেন। যেহেতু পবিত্র হজ্ব পালনের সুযোগ দেওয়ার জন্য এ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, সেজন্য হজ্ব আমানতের উপর ৩ বছর মেয়াদী মুদারাবাহ আমানতের চেয়ে বেশী হারে মুনাফা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

হজ্ব আমানতের টাকা হিসাব থেকে তোলা যায় না, এরূপ জমাকারীদের কোন চেকবই দেওয়া হয় না, তবে জমার রসিদ দেওয়া হয়। কোন হজ্ব আমানত জমাকারী যদি সিদ্ধান্ত করেন যে তিনি হজ্ব করার ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন এবং জমাকৃত অর্থ উঠিয়ে নেবেন, তাহলে তাঁকে ব্যাংকের মুদারাবাহ সঞ্চয়ী হিসাবের সমহারে মুনাফা দেওয়া হয়।

কোন জমাকারী যদি নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হজ্ব পালন করতে চান, তাহলে তাঁকে জমাকৃত অর্থের সাথে প্রয়োজনীয় খরচের জন্য বাকী অর্থ জমা করতে হয়।

নির্ধারিত সকল কিস্তি জমা দেওয়ার পর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা যোগ করে যদি দেখা যায়, সে বছর হজ্বের নির্ধারিত খরচের তুলনায় জমাকৃত অর্থ কম হচ্ছে তাহলে হজ্ব পালন করার জন্য জমাকারীকে খরচের বাকী টাকা জমা দিতে হবে। আর যদি দেখা যায়, হজ্বের যাবতীয় খরচ বাদে হিসাবে টাকা অবশিষ্ট আছে, তাহলে ব্যাংক অতিরিক্ত অর্থ জমাকারীকে ফেরত দিবে। হজ্ব হিসাব কেবলমাত্র হজ্ব পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির নামেই খোলা যায়।

লাভ-লোকসান বন্টন পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের মুদারাবাহ আমানত, যেমন-মুদারাবাহ বিশেষ নোটিশ আমানত, মুদারাবাহ সঞ্চয়ী আমানত এবং মুদারাবাহ বিভিন্ন মেয়াদী আমানতের গুরুত্ব ও মেয়াদ

www.pathagar.com

বিবেচনা করে ব্যাংক একটি ওয়েটেজ (Weightage) পদ্ধতি স্থির করেছে। এসব আমানতের উপর লাভ-লোকসান বন্টন করার সময় উক্ত ওয়েটেজ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাংক এর বিভিন্ন ধরনের মুদারাবাহ আমানতের অর্থ খাটিয়ে যে লাভ পায়, প্রথমে চুক্তি অনুসারে তার কমপক্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ বা সম্ভব হলে তদুর্দ্ধ অংশ মুদারাবাহ আমানতকারীদের জন্য পৃথক করে নেয়। অতঃপর নির্ধারিত ওয়েটেজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই অর্থ বিভিন্ন ধরনের মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করে।

ব্যাংক সাধারণতঃ এর বার্ষিক সম্ভাব্য মুনাফা ধরে তার ভিত্তিতে হিসাব করে সকল প্রকার মুদারাবাহ আমানতকারীদের হিসাবে মুনাফার অংশ জমা করে দেয়। অতঃপর বছর শেষে চূড়ান্ত হিসাব করার পর এবং ব্যাংকের নিয়োগকৃত অডিটরদের দ্বারা যথাযথ অডিট করানোর পর মুদারাবাহ অর্থ বিনিয়োগ থেকে প্রকৃত লাভের অংক নির্ধারণ করা হয় এবং এই লাভের প্রাপ্য অংশ জমাকারীদের মধ্যে বন্টনের মাধ্যমে প্রকৃত ও চূড়ান্ত লাভের হার স্থির করা হয়।

যদি দেখা যায় যে, জমাকারীদের হিসাবে ইতিপূর্বে যে হারে লাভ দেওয়া হয়েছে তা প্রকৃত ও চূড়ান্ত হারের চেয়ে কম, তাহলে মুনাফার অবশিষ্ট প্রাপ্য অংশ জমাকারীদের হিসাবে জমা করে দেওয়া হয়। আর যদি দেখা যায়, জমাকারীদেরকে প্রভিশনাল ভিত্তিতে প্রদত্ত হার প্রকৃত ও চূড়ান্ত হারের চেয়ে বেশী, তাহলে প্রদত্ত মুনাফার অতিরিক্ত অংশ জমাকারীদের হিসাব থেকে উসুল করা হয়। এভাবে প্রভিশনাল ভিত্তিতে প্রদত্ত মুনাফা প্রকৃত মুনাফার সাথে সমন্বয় করা হয়। যে ওয়েটেজের ভিত্তিতে ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করে তা নীচে দেওয়া হলো ঃ

হিসাব	গুরুত্বের হার
১. মুদারাবাহ হজ্ব আমানত	১.১০
২. মুদারাবাহ ৩ বছর মেয়াদী হিসাব	১.০০
৩. মুদারাবাহ ২ বছর মেয়াদী হিসাব	০.৯৮
৪. মুদারাবাহ ১ বছর মেয়াদী হিসাব	০.৯৬
৫. মুদারাবাহ ৬ মাস মেয়াদী হিসাব	০.৯২
৬. মুদারাবাহ সঞ্চয়ী হিসাব	০.৭৫
৭. মুদারাবাহ বিশেষ নোটিশ হিসাব	০.৩৫

মুদারাবাহ আমানতসমূহের অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংকের লোকসান হলে সে লোকসানের সাকুল্য অংশ মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে তাদের জমার স্থিতি অনুপাতে বন্টন করা হয়। তবে একথা ঠিক যে, ব্যাংকের বিনিয়োগে লোকসান হওয়া স্বাভাবিক নয়। প্রথমতঃ ব্যাংকের বিনিয়োগ থাকে বিভিন্নমুখী এবং ব্যাপক। ফলে কোন

www.pathagar.com

বিশেষ ক্ষেত্রে বা খাতে লোকসান হলেও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত লাভ মিলে সার্বিকভাবে লাভ হওয়াই স্বাভাবিক। তবু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ভবিষ্যতের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে প্রতি বছর ব্যাংকের লাভের অংশ থেকে সর্বোচ্চ শতকরা ১৫ ভাগ লাভ সঞ্চয় করে একটি ক্ষতিপূরণ তহবিল (Loss offsetting Reserve) গড়ে তুলছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন হিসাবে জমা গ্রহণ ছাড়াও আর্নেস্টমানি ও সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণ করা হয় এবং তার রসিদ দেয়া হয়। এই রসিদ হচ্ছে পেমেন্ট অর্ডার। কোন টেন্ডার কিংবা চুক্তিনামার জন্য Caution Money বা Security Deposit হিসাবে এ রসিদ ব্যবহার করা যায়।

বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অর্থ বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

১. বাই-মোয়াজ্জাল চুক্তিতে বিক্রয়

নগদ দাম পরিশোধ করতে অপারগ বা অনিচ্ছুক কোন গ্রাহক ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় কোন পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করার প্রস্তাব দিলে ব্যাংক প্রথমে উক্ত পণ্যের কাটতি, বাজার দাম, সম্ভাব্য মুনাফা, ক্রেতার বিশ্বাসযোগ্যতা, দাম পরিশোধের সময়, পরিশোধের ধরন ইত্যাদি বিষয় সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে সবকিছু অনুকূল হলে বাজার থেকে নগদ দামে উক্ত পণ্য ক্রয় করে গ্রাহকের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত দামে ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত তারিখে বা নির্ধারিত কিস্তি অনুসারে মূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের কাছে মাল হস্তান্তর করে।

এরূপ বাকীতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক ক্রেতার কাছ থেকে পণ্যমূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যের সম্পত্তি জামানত হিসেবে বন্ধক রাখে।

গ্রাহক সময়মত দাম পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে পণ্যের মূল্য আদায় করে। কোন অবস্থাতেই ব্যাংক একবার ধার্যকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে না। তবে ইচ্ছাকৃত খেলাপী গ্রাহকের বেলায় ব্যাংক ক্ষতিপূরণ আদায় করে থাকে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দাম পরিশোধ করলে ব্যাংক রেয়াত (Rebate) দিয়ে থাকে। বাই-মোয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রয়ের বেলায় ব্যাংক পণ্যের ক্রয়মূল্য এবং ব্যাংকের মুনাফা পৃথক পৃথকভাবে জানায় না।

২. বাই-মুরাবাহা চুক্তিতে বিক্রয়

বাই-মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুসারে পণ্য ক্রয় করে ক্রয়-মূল্যের সাথে উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে ভবিষ্যতের নির্ধারিত

www.pathagar.com

কোন সময়ে এক সাথে বা নির্ধারিত কিস্তিতে দাম পরিশোধ করার শর্তে গ্রাহককে উক্ত পণ্য সরবরাহ করে। অতঃপর মালের উপর ব্যাংকের মালিকানা থাকে না; তবে ব্যাংক সিকিউরিটি হিসেবে উক্ত পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রেখে দেয়। গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে একসাথে দাম পরিশোধ করে মাল ছাড়িয়ে নেয়; অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য দিয়ে সমপরিমাণ মাল ছাড়িয়ে নেয়।

মুরাবাহা বিক্রয়ের সময় ব্যাংক সাধারণতঃ পণ্যমূল্যের ২৫% থেকে ৩০% ডাউন পেমেন্ট (Down Payment) বা নগদ মার্জিন (Cash Margin) নেয় এবং প্রয়োজনবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি বন্ধক রাখে। ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে মাল থাকাকালে মালের গুদাম ভাড়া এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ গ্রাহকের উপর ধার্য করা হয়; তবে ব্যাংক কোন অবস্থাতেই মালের নির্ধারিত মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে না। গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে মাল ছাড়িয়ে নিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক উক্ত মাল বিক্রি করে পাওনা উসুল করে। ব্যাংক তার পাওনার চেয়ে বেশী দাম পেলে অতিরিক্ত অংশ গ্রাহককে ফেরত দেয়; কিন্তু কম পেলে তা গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করে।

ব্যাংক ইচ্ছাকৃত খেলাপী গ্রাহকের কাছ থেকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।

মাল গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরের পর গ্রাহকই মালের মালিক হয় আর ব্যাংক হয় মালের জামানতদার।

৩. বাই-সালাম

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাই–সালাম পদ্ধতিতে শিল্প ও কৃষিপণ্য অগ্রিম ভিত্তিতে ক্রয় করে থাকে।

চুক্তি করার পর ব্যাংক পণ্যের নির্ধারিত দাম অগ্রিম পরিশোধ করে দেয়।

বিক্রেতা ভবিষ্যতের নির্ধারিত সময়ে বা সময়ের মধ্যে ব্যাংককে মাল সরবরাহ করে। সময়মত মালপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক বিক্রেতার কাছ থেকে জামানত গ্রহণ করে। ব্যাংক এক সাথে অথবা কিস্তিতে মাল সরবরাহ নিতে পারে। চুক্তির সময়ে পণ্যের নাম, গুণাগুণ, পরিমাপ, দাম, সরবরাহের সময় ও স্থান এবং সরবরাহের ধরন উল্লেখ করা হয়। ব্যাংক ক্রীত মাল বাই–মোয়াজ্জাল, মুরাবাহা পদ্ধতিতে অথবা নগদ দামে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে।

৪. ভাড়ায় ক্রয় (Hire Purchase)

ভাড়ায় ক্রয় ব্যবস্থায় ব্যাংক দুই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে ঃ (ক) ক্রম হ্রাসমান মালিকানা ভিত্তিতে এবং (খ) ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া দান পদ্ধতিতে।

www.pathagar.com

ক. ক্রম হ্রাসমান মালিকানা ঃ এ পদ্ধতিকে মালিকানায় অংশীদারী ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয়ও (Hire Purchase under Shirkatul Meelk) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যাংক আগ্রহী গ্রাহকের সাথে অর্থ যোগান দিয়ে বাড়ী, গাড়ী বা মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করে নির্ধারিত ভাড়ায় গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয় এবং নির্ধারিত কিস্তিতে ব্যাংকের মালিকানাভুক্ত অংশ ক্রয় করার সুযোগ দেয়।

সম্পদের উপর পুঁজির অনুপাতে উভয়ের মালিকানা থাকে; কিন্তু গ্রাহক সম্পদ দখল ও ভোগ করে। গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া ও কিস্তি পরিশোধ করে ক্রমে সম্পদের উপর তার মালিকানা অংশ বাড়াতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পদের পূর্ণ মালিকানা লাভ করে। ব্যাংকের মালিকানা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে এর ভাড়ার পরিমাণ কমতে থাকে এবং মালিকানা শেষ হলে আর ভাড়া পায় না।

খ. ভাড়ার চুক্তিতে ক্রয় (Hire Purchase): ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এই ব্যবস্থায় গ্রাহকের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে বাড়ী, গাড়ী বা কোন মূল্যবান সম্পদ ক্রয় করে। অতঃপর উভয়ের সম্মতিক্রমে ভাড়া ধার্য করে উক্ত সম্পদ এই শর্তে গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয় যে, গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তিতে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে পণ্যটি ক্রয় করে নিবে।

সম্পদের উপর ব্যাংকের মালিকানা বহাল থাকে; কিন্তু শর্ত অনুসারে নির্ধারিত ভাড়া ও কিস্তি পরিশোধ সাপেক্ষে গ্রাহক সম্পদ দখল ও ভোগ করে। কিস্তি পরিশোধ শেষ হলে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে মালিকানা হস্তান্তর করে।

৫. ইজারা বা লীজ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কারখানার যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বাড়ী-ঘর, জাহাজ প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় রেখে নির্ধারিত ভাড়ার চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইজারা বা লীজ দেয়।

ইজারা-গ্রহীতা ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে সম্পদ দখল ও ব্যবহার করে।

মেয়াদ শেষে ব্যাংক উক্ত পণ্য ইজারা-গ্রহীতার কাছে বা অন্য কারো কাছে বিক্রি করে।

৬. মুশারাকাহ বা অংশীদারী বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মুশারাকাহ ভিত্তিতে কোন উদ্যোক্তার সাথে অথবা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোন কারবারের মূলধনে অংশ নেয় অথবা কোন জয়েন্ট স্টক কোম্পানী বা সরকারী বা বেসরকারী লাভজনক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং স্টক ক্রয় করে।

www.pathagar.com

এতে ব্যাংক অংশীদার হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে। কারবারে লাভ হলে নির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়। কিন্তু লোকসান হলে উভয়ে পুঁজির অনুপাত অনুসারে তা বহন করে। কারবারের সম্পদ ব্যাংকের কাছে জামানত থাকে। উদ্যোক্তাকে তার ব্যবস্থাপনা কাজের জন্য অতিরিক্ত অনুপাতে মুনাফা দেয়া হয়।

৭. বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়

ব্যাংক নগদ ও উপস্থিত ভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়–বিক্রয় করে এবং ক্রয়–মূল্য ও বিক্রয়–মূল্যের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করে।

ইসলামী ব্যাংকের অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতি, যেমন–মুদারাবাহ, স্বাভাবিক মুনাফার হার, বিনিয়োগ নিলাম ইত্যাদি পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এখনো কোন বিনিয়োগ করেনি। তবে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যাংক পরিকল্পনা করছে।

৮. করজে হাসানাহ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গ্রাহকদের বিশেষ প্রয়োজনে করজে হাসানাহ দিয়ে থাকে। এরূপ লেনদেনে ব্যাংক ঋণ–গ্রহীতার কাছ থেকে প্রকৃত খরচ (Service Charge) আদায় করে। মুদারাবাহ মেয়াদী হিসাবধারীদের সাময়িক অর্থাভাব পূরণ করার জন্য মেয়াদী জমা জামানত রেখেও ব্যাংক করজে হাসানাহ দেয়।

অন্যান্য কাজ

১. অর্থ হস্তান্তর ও স্থানান্তর ঃ ব্যাংক ডিডি, টিটি, এমটি ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকদের অর্থ হস্তান্তর ও স্থানান্তর করে এবং বিনিময়ে সেবা–মূল্য গ্রহণ করে।
২. ব্যাংক সার্টিফিকেট ও শেয়ার গ্রহণ ও নবায়ন করে।
৩. মূল্যবান দলিলপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজত করে।
৪. লকার ভাড়া দেয়।
৫. গ্রাহকের ট্রাস্টী হিসেবে কাজ করে।
৬. গ্রাহকদের দাবী আদায় ও তাদের পক্ষে দেশী–বিদেশী ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করে।
৭. ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়সহ আমদানী, রপ্তানী ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

www.pathagar.com

১। আমদানী ঃ প্রচলিত আমদানী নীতির অধীনে ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য পণ্য ও উপকরণ আমদানী করার জন্য কমিশনের বিনিময়ে ঋণপত্র (L/C) খুলে থাকে। আমদানীর ক্ষেত্রে যেখানে ১০০% মার্জিনে এলসি খোলে, সেখানে ব্যাংক কেবল কমিশন এবং ফ্যাক্স, তার ইত্যাদির জন্য সেবা–মূল্য (Service charge) পায়।

গ্রাহক ১০০ ভাগ মার্জিন না দিয়ে যদি আংশিক দেয়, তাহলে বাকী অর্থ যোগান দিয়ে ব্যাংক আমদানীকারীর সাথে অংশীদারী ভিত্তিতে পণ্য আমদানী করে অথবা প্রদত্ত মার্জিনকে সিকিউরিটি বা ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করে বাই–মোয়াজ্জাল বা বাই–মুরাবাহা ভিত্তিতে পণ্য আমদানী ও বিক্রি করে।

মাল বিক্রি করে লাভ হলে পূর্ব–নির্ধারিত অনুপাতে ব্যাংক ও গ্রাহক তা ভাগ করে নেয়। লোকসান হলে উভয়ে নিজ নিজ পুঁজির অনুপাতে তা বহন করে। আমদানীকৃত মাল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং গ্রাহক সেখান থেকে মাল বিক্রি করে। মালের গুদাম ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ কারবার থেকে বহন করা হয়।

তৃতীয় পদ্ধতিতে যেখানে গ্রাহক কোন মার্জিন দেয় না, সেখানে মুরাবাহা চুক্তির ভিত্তিতে মাল আমদানী করা হয়। ব্যাংক মালের দাম পরিশোধ করে মালিক হয় এবং পরে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করে মাল জামানত হিসেবে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রাখে। গ্রাহক কিস্তিতে বা এক সাথে দাম পরিশোধ করে মাল ছাড়িয়ে নেয়। ব্যাংক ওয়েজ আর্নার্স স্কীমের অধীনেও এলসি খুলে থাকে।

২। রপ্তানী ঃ ব্যাংক কমিশন ও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে রপ্তানী বাণিজ্যে সহযোগিতা করে থাকে। রপ্তানীর ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। রপ্তানী পণ্য উৎপাদনে ও শিপমেন্টে সহযোগিতার জন্য মুশারাকাহ ভিত্তিতে রপ্তানী–পূর্ব অর্থায়ন (Pre-shipment Finance) করে থাকে।

৩। রেমিটেন্স ঃ ব্যাংক দেশের ভিতরে ও বাইরে অর্থ স্থানান্তর ও হস্তান্তর করে থাকে। অন্তর্গামী টিটি, এমটি ও ড্রাফট এবং বহির্গামী টিটি ও ড্রাফট প্রভৃতি আদান–প্রদান এর অন্তর্ভুক্ত।

৪। বিবিধ কাজ ঃ ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে চেক ও বিল কালেকশন করে।

- ❒ ট্র্যাভেলার্স চেক ইস্যু, ক্রয় ও বিক্রয় করে এবং বিদেশ ভ্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দেয়।
- ❒ বাংলাদেশ ভ্রমণকারী ট্যুরিস্ট অথবা ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক মুদ্রা ভাঙ্গিয়ে দেয়।
- ❒ পবিত্র হজ্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং কার্যাবলী আঞ্জাম দেয়।

www.pathagar.com

- আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে এবং বিড বন্ড ইস্যু করে এবং এর বিনিময়ে কমিশন ও সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে।

বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব ঃ ব্যাংক বিদেশী নাগরিক, মিশন, দূতাবাস ও প্রবাসী বাংলাদেশী গ্রাহকের নামে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব খুলে থাকে এবং এতে গ্রাহকের বৈদেশিক মুদ্রা জমা নেয়।

আল-ওয়াদিয়া, আল-মুদারাবাহ ইত্যাদি যে কোন চুক্তিতে এ হিসাব খোলা যায়। মুদারাবাহ চুক্তিতে গৃহীত আমানতের উপর চুক্তি অনুসারে মুনাফা দেওয়া হয়।

বিদেশী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংকের সাথে ব্যাপক যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ব্যাংকের ৪৩৬টিরও অধিক করেসপন্ডেন্ট ব্যাংক রয়েছে।

কল্যাণমূলক বিনিয়োগ প্রকল্প

সমাজের স্বল্প-আয়ের লোকদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যাংক কতিপয় কল্যাণমুখী বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

ক্ষুদ্র যানবাহন প্রকল্প (আয় থেকে দায় শোধ)

এই প্রকল্পের অধীনে শিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প মুনাফায় বেবী ট্যাক্সী, টেম্পো এবং মিশুক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পরে যাতে চালকগণ আয় থেকে দায় শোধ করে এসব যানবাহনের মালিক হতে পারে, সেভাবে এ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প

তরুণ ডাক্তারদের চিকিৎসা কাজে সহায়তা করা এবং গ্রামাঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক এ প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে ব্যাংক ডাক্তারদের চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় কাজের সুবিধার্থে সহজ শর্তে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করে দেয় এবং চেম্বার ও ক্লিনিক স্থাপনে সহযোগিতা করে। ডাক্তারগণ আয় থেকে সহজেই ব্যাংকের দেনা পরিশোধ করতে পারেন।

ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সম্ভাবনাশীল শিক্ষিত যুবকদের জামানত ছাড়াই ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবংগ্রামীণ শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চাষ-যন্ত্র, সেচ-যন্ত্র এবং অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম সহজ শর্তে ক্রয় করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে পল্লী এলাকার লোকদের আয়-বৃদ্ধি এবং আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জামানত ছাড়াই ১০ হাজার টাকা বিনিয়োগ সুবিধা দান করা হয়।

গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প

নির্ধারিত আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের অধীনে টেলিভিশন, ফ্রীজ,গ্যাস কুকার, আসবাবপত্র ইত্যাদি গৃহসামগ্রী ক্রয় করে দেওয়া হয়।

গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প

শহরাঞ্চলে গৃহ সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ব্যাংক বাই-মোয়াজ্জাল, ভাড়ায় ক্রয় ইত্যাদি পদ্ধতিতে বাসগৃহ নির্মাণে বিনিয়োগ করার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

হকার বিনিয়োগ প্রকল্প

দরিদ্র হকারগণ যাতে তাদের ব্যবসা ভালভাবে চালাতে পারে, সেজন্য সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ব্যাংক সহজ শর্তে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা দিয়ে থাকে।

পোলট্রি বিনিয়োগ প্রকল্প

সম্প্রতি ব্যাংক ডিম এবং হাঁস-মুরগীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোলট্রি বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে।

শরীয়া কাউন্সিল

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যাতে শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান ও তদারকীর জন্য দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি শরীয়া কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। ব্যাংকের জন্মলগ্ন থেকে শরীয়া কাউন্সিল বিভিন্ন কাজে ব্যাংককে শরয়ী ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আসছে। ব্যাংকের পলিসি ও সিদ্ধান্তসমূহ শরীয়তসম্মত হওয়ার ব্যাপারে কাউন্সিল সর্বদা পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়া শাখা পর্যায়ে শরীয়তের নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা কাউন্সিল সে ব্যাপারেও ইন্সপেকশন করে এবং বোর্ডে রিপোর্ট দেয়। প্রতি বছর ব্যাংকের আয়-ব্যয় যথার্থ শরীয়তসম্মত কিনা সে ব্যাপারেও কাউন্সিল রিপোর্ট দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

ব্যাংকের শরীয়া কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে ৬ জন হচ্ছেন শরীয়ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও সিদ্ধান্ত দানে সক্ষম খ্যাতিমান আলেম। এছাড়া রয়েছেন ইসলামী ও প্রচলিত আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দক্ষ একজন আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত দু'জন অর্থনীতিবিদ এবং একজন প্রবীণ ব্যাংকার।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান নয়, বরং ইসলামের মহান লক্ষ্য অনুসারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় যুলুম-শোষণের অবসান ঘটিয়ে সুবিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন করাও এর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার জন্মলগ্ন থেকে ব্যাংকের নিজস্ব যাকাতের অর্থ এবং ব্যাংকের উদ্যোক্তা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে সংগৃহীত দানের দ্বারা সাদাকাহ তহবিল গঠন করে দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এই কাজকে আরো সম্প্রসারিত ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে ব্যাংক সাদাকাহ তহবিলকে পুনর্গঠন করে 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন কায়েম করে। ঐ বছর সর্বমোট ৩.৮০ কোটি টাকার তহবিল নিয়ে ফাউন্ডেশন এর যাত্রা শুরু করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রধান প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

- ❒ দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সহায়তা করা;
- ❒ গণশিক্ষায় সহযোগিতা করা;
- ❒ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-সেবা সম্প্রসারিত করা;
- ❒ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- ❒ মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্প পরিচিতি

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফাউন্ডেশন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এযাবত ফাউন্ডেশন বিভিন্নমুখী সমাজকল্যাণমূলক কাজে প্রায় সোয়া নয় কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ফাউন্ডেশনের গৃহীত প্রকল্পগুলো হচ্ছে ঃ

১. আয়-বর্ধন প্রকল্প (Income Generating Scheme)

এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ স্বাস্থ্য-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান ও চিকিৎসা-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়; এছাড়া পোলট্রি, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় পুঁজি যোগান

www.pathagar.com

দেওয়া হয়। রিক্সা, সেলাই মেশিন ও দুধেল গাভী সরবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়।

২. বিক্রয় কেন্দ্র (মনোরম)

পল্লী অঞ্চলের অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করা এবং তাদের তৈরী তাঁতের কাপড়, হস্তশিল্প, পোষাক ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য রাজধানী নগরীতে 'মনোরম' নামে একটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। মহিলারা যাতে শরীয়তের সীমার মধ্যে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে এবং সম্মানজনকভাবে জীবন-যাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে মহিলাদের জন্য সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোষাক উদ্ভাবন, নারী সমাজ যাতে ইসলামী নীতিমালার মধ্যে রুচিশীল পোষাক পড়তে উৎসাহবোধ করেন, এ লক্ষ্যে ঢাকা নগরীর সোনারগাঁও রোডে একটি বহুমুখী শপিং কমপ্লেক্স চালু করা হয়েছে।

৩. শিক্ষা প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে ফাউন্ডেশন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, বই ক্রয়ে সাহায্য দান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

৪. স্বাস্থ্য প্রকল্প

শিশু ও মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, দরিদ্র রুগীদের চিকিৎসা সাহায্য দান এবং গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাজ।

৫. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রকল্প

ফাউন্ডেশন ঢাকা নগরীতে দরিদ্র লোকদের স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৬০-শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল চালু করেছে। হাসপাতালে আউটডোরে চিকিৎসা সুবিধাসহ প্যাথোলজি, সার্জারী, গাইনী, কিডনী, মেডিসিন ইত্যাদি বিভাগ রয়েছে। হাসপাতাল 'লাভ নয় লোকসান নয়' ভিত্তিতে চালানো হয় বলে রুগীদের কাছে কেবলমাত্র প্রকৃত খরচ নেওয়া হয়।

৬. মানবিক সাহায্য প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র পিতার কন্যার বিয়ে এবং নদী ভাঙ্গনে সর্বহারাদের সাহায্য করা হয়।

www.pathagar.com

৭. জরুরী রিলিফ তৎপরতা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের স্থায়ী পুনর্বাসন, তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

৮. সার্ভিস সেন্টার

ফাউন্ডেশন উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ী সার্ভিস সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেন্টারগুলো সমন্বিত সমাজ উন্নয়নের কেন্দ্ররূপে কাজ করতে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৯. মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের বিপুল বেকার যুবশক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করা এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ঢাকা নগরীতে মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

১০. দাওয়াহ কর্মসূচী

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বিচারক, আইনবিদ, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কর্মকর্তা, ব্যাংকার, সাহিত্যিক এবং গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ, অডিও-ভিজুয়াল ক্যাসেট বিতরণ ইত্যাদি এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়াও ফাউন্ডেশন মডেল স্কুল প্রকল্প, মসজিদ ভিত্তিক আয়-বর্ধন প্রকল্প এবং বন্দী পুনর্বাসন প্রকল্প ইত্যাদি বিভিন্নমুখী উন্নয়নমূলক ও সমাজ-সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সমস্যা

স্বল্প সময়ের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমানে বেসরকারী খাতে অন্যান্য সকল ব্যাংকের তুলনায় অগ্রবর্তী স্থানে অবস্থান করছে। সুদী পরিবেশে শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত এ ব্যাংকের সাফল্য কেবল বাংলাদেশে নয়, দেশের বাইরেও চিন্তাশীলদের মধ্যে নবতর আশার সঞ্চার করেছে। তবে এ ব্যাংকের সামনে কতিপয় সমস্যা রয়েছে যার সমাধান অত্যাবশ্যক। সমস্যাগুলো সম্পর্কে নীচে আলোকপাত করা হলো।

১. উপযোগী আইনের অভাব

দেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক আইন শরীয়তের নীতিমালার উপর ভিত্তিশীল নয়। ফলে ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি আইনের সহযোগিতা ও সমর্থন

www.pathagar.com

পাচ্ছে না। এছাড়া দেশের প্রচলিত ঋণ আইন ও বিচার ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও দীর্ঘসূত্রী। আইনের মাধ্যমে খেলাপী ঋণ আদায়ে ৫ থেকে ১০ বছর কিংবা তারও অধিক সময় দরকার হয়। সুদী ব্যাংকগুলো এ অবস্থায় তবু পুরো সময়ের জন্য সুদ আদায় করার সুযোগ পায়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক অতিরিক্ত সময়ের জন্য পণ্যের দাম বাড়াতে পারে না। ফলে ইসলামী ব্যাংকের জন্য পৃথক আইন-কাঠামো এবং দ্রুত বিচার ফায়সালার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

২. বীমা সুবিধার অভাব

ইসলামী ব্যাংক তার যাবতীয় কার্যক্রম শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অথচ বীমার জন্য ব্যাংককে সুদী কোম্পানীর কাছে যেতে বাধ্য হতে হয়। ইসলামী ব্যাংকিং যাতে সম্পূর্ণ শরীয়তের ভিত্তিতে চলতে পারে এবং এর গ্রাহকগণ যাতে সুদী বীমা করতে বাধ্য না হয়, সেজন্য ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

৩. ইসলামী সিকিউরিটি ও বন্ডের অভাব

সুদী ব্যাংকগুলো সরকারের সুদভিত্তিক সিকিউরিটি ও বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায় এবং সুদ অর্জন করে। ইসলামী ব্যাংক এসব সিকিউরিটি ও বন্ড ক্রয় করতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের উৎপাদনশীল, লাভজনক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য অর্থ-সংস্থানের লক্ষ্যে মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ ভিত্তিতে সিকিউরিটি ও বন্ড ছাড়ার ব্যবস্থা নিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার অনুরূপ ব্যবস্থা নিলে ইসলামী ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্য বিনিয়োগ করে ব্যাংক এর গ্রাহকদের জন্য আরো বেশী মুনাফা অর্জনের সুযোগ লাভ করবে। অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে এবং সরকারও লাভবান হবেন।

৪. দক্ষ জনশক্তির অভাব

এদেশে একাধিক ইসলামী ব্যাংক কাজ করছে। এদের শাখা সংখ্যা ইতোমধ্যে একশ'র কোটা ছাড়িয়ে গেছে। অচিরেই আরো ইসলামী ব্যাংক কায়েম হতে যাচ্ছে। এসব ব্যাংকের জন্য বিপুল জনশক্তির দরকার। কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে 'ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা' এখনো উপযুক্ত স্থান পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্তি পায়নি। ফলে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরী লোক পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে নিজস্বভাবে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে জনশক্তি তৈরী করে নিতে হয়, যা অত্যন্ত জটিল এবং সময়-সাপেক্ষ।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

তথ্যপঞ্জী

২য় অধ্যায়

১. লজ অব মালয়েশিয়া ; এ্যাক্ট নং ২৭৬। ১৯৮৩ সালের ৯ মার্চ রাজকীয় অনুমোদন-প্রাপ্ত। ১৯৮৩ সালের ১০ মার্চ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত পৃঃ ৮।

২. আল-কুরআন ঃ ২ : ২৭৫।

৩. আল-কুরআন ঃ ১১২ : ১।

৪. আল-কুরআন ঃ ১ : ১।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ মুসলিম ইকোনোমিক থিংকিং ঃ এ সার্ভে অব কন্টেম্পোরারী লিটারেচার, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউকে, ১৯৮১, পৃঃ ৪।

৭. আল-কুরআন ঃ ৫৪ঃ৩,১৪; ২ঃ২৬; ৩ঃ৫১,৫৬

৮. আল-কুরআন ঃ ১২:৬৭; ৬:৬২; ৬:৫৭।

৯. ডঃ খুরশীদ আহমদ, ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইন এন ইসলামিক ফ্রেমওয়ার্ক; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউ.কে.।

১০. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫। (আল-কুরআন ৭: ৩৫)।

১৩. আল-কুরআন ঃ ২: ৩০; ৬: ১৬৫; ৩৫: ৩৯; ৫৭: ৭।

১৪. আবুল হাসান মোঃ সাদেক ঃ ইনট্রোডাকশন ঃ ইসলামিক ইকোনোমিক থটঃ রীডিংস ইন ইসলামিক ইকোনোমিক থটঃ পৃঃ ৪ সম্পাদনা-আবুল হাসান মোঃ সাদেক ও আইদিত গাজালিঃ লংম্যান, মালয়েশিয়া এসডিএন, বিএইডি, ১৯৯২।

১৫. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা ; পৃঃ ২ ; অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন; ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৯।

www.pathagar.com

৩য় অধ্যায়

১. আল–কুরআন ঃ ২: ২৭৫।
২. মুহাম্মদ বিন জাবির আততাবারী ঃ খন্ড ৭, পৃঃ ২০৪।
৩. বায়হাকী ঃ খন্ড–৫, পৃঃ ২৭৫।
৪. বুখারী ঃ কিতাবুল ব্যুরো; মুসলিম ও আহমদ।
৫. আল–ফখর আর–রাযীঃ দি বিগ ইন্টারপ্রিটেশন, খন্ড ৭, প্রথম সংস্করণ (মিশর–ইজিপশিয়ান কাহিয়া প্রেস, ১৯৩৮), পৃঃ ৯১।
৬. আবু বকর আল জাসাস ঃ আহকামুল কুরআন, ১ম খন্ড।
৭. উদ্ধৃত করেছেন ঃ আফজালুর রহমান ঃ ইকোনোমিক ডকট্রিনস অব ইসলাম।
৮. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, বাংলা অনুবাদ ঃ আব্বাস আলী খান ও আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯, পৃঃ ৮৭।
৯. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ টুওয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারী সিস্টেম, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫, পৃ ঃ ৫৭।
১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।
১১. বুখারী ও মুসলিম।
১২. আহমদ ও মুসলিম।
১৩. বুখারী ও মুসলিম।
১৪. সামি হাসান হামদ ঃ ইসলামিক ব্যাংকিং, এ্যারাবিয়ান ইনফরমেশন লিঃ, লন্ডন, ১৯৮৬, পৃঃ ১৩৮।
১৫. আল–কুরআন ঃ ২:২৭৫।
১৬. আল–কুরআন ঃ ২: ২৭৮–২৭৯।
১৭. মুসলিম, তিরমিজী, মুসনাদে আহমদ।
১৮. এরিস্টোটল ঃ পলিটিক্স, পৃঃ ২৩ ও ১১১।
১৯. প্ল্যাটো ঃ লজ বুক–৫।
২০. বোম বাওয়ার্ক ঃ ক্যাপিটাল এন্ড ইন্টারেস্ট, খণ্ড–১, ১৯৫৯, পৃঃ ১০–১১।
২১. দি পজিটিভ থিওরী অব ইন্টারেস্ট, পৃঃ ৩৪।
২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।
২৩. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ও শাহ্ মোঃ হাবিবুর রহমান অনূদিতঃ ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন, ১৯৮৩, পৃঃ ৮৬।

www.pathagar.com

২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।
২৫. উদ্ধৃত করেছেন, আফজালুর রহমান, ইকোনমিক ডকট্রিনস অব ইসলাম। ৩য়, খন্ড, পৃঃ ১১।
২৬. আফজালুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।
২৭. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ও শাহ্ মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।
২৮. জে এম কীনস, জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এ্যান্ড মানি, পৃঃ ৩৫১।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০।
৩০. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ও শাহ্ মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

৪র্থ অধ্যায়

১. ডঃ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ঃ ইসলাম এ্যান্ড দি থিওরী অব ইন্টারেস্ট, পৃঃ ১৪৮।
২. জে. এম. কীনস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।
৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১০-১১১।
৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫১।
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫১।
৬. ডঃ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪-১৮৫।
৭. ডঃ এম. ওমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬।
৮. ডব্লিও. সি. মিচেল ঃ হোয়াট ডেবলেন থট, পৃঃ সধধশ ঃ উদ্ধৃত করেছেন শেখ মাহমুদ আহমদ ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান, পৃঃ ১৩।
৯. শেখ মাহমুদ আহমদঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ১৪।
১১. ডঃ এম. ওমর চাপরা, মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন অনূদিতঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
১২. ঐ, টুওয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারী সিস্টেম, পৃঃ ৯৮।
১৩. মওদূদী ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২।
১৪. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইস্যুজ ইন ইসলামিক ব্যাংকিং, সিলেকটেড পেপারস, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন; ইউ.কে; ১৯৮৩, পৃঃ ৮২।
১৫. উদ্ধৃত করেছেন ঃ ডঃ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ঃ ইসলাম এ্যান্ড দি থিওরী অব ইন্টারেস্ট, এম. এইচ. মুহাম্মদ আশরাফ, লাহোর, ১৯৭৪, পৃঃ ১৬৬।

www.pathagar.com

১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৬।

১৭. ম্যাকমিলান কমিটি রিপোর্ট ঃ মিনিটস অব এভিডেন্স, খন্ড ৩, পৃঃ ৩৩৫।

৫ম অধ্যায়

১. মোহাম্মদ আরিফ ও এম এ মান্নান সম্পাদিত ঃ ডেভেলপিং এ সিস্টেম অব ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস, ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ১৯৯০, পৃঃ ২১১, টিকা (২)।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫।

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯।

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫।

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯।

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯।

১০. ডঃ ডি. এম. কোরেশীঃ দি রোল অব শরীয়া বেইজ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট ইন এ মুসলিম কান্ট্রি, ইন মোহাম্মদ আরিফ ও এম. এ. মান্নান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২।

১১. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

১৭. ডঃ ডি. এম. কোরেশী ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৫২।

১৮. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

www.pathagar.com

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

২২. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৭০।

২৩. ডঃ ডি. এম. কোরেশী ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৫২।

২৪. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত পৃঃ ১৬৭।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।

২৭. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইস্যুজ ইন ইসলামিক ব্যাংকিং, সিলেকটেড পেপারস, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউ. কে. ১৯৮৩, পৃঃ ১৪২।

২৮. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৬৯।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১-১৭২।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭২।

অষ্টম অধ্যায়

১. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

৫. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ পার্টনারশিপ এ্যান্ড প্রোফিট-শেয়ারিং ইন ইসলামিক ‘ল’, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫, পৃঃ ১৫।

৬. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৪৮।

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

১০. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৭।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

www.pathagar.com

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।
১৭. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৪৯।
১৮. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৯।
১৯. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৪৯।
২০. ডঃ ইউসুফ উদ্দীন ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, প্রথম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃঃ ২২২।
২১. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৪৯।
২২. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৯।
২৩. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, ২৪৯।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯।
২৫. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৪৯।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯।
২৭. ডঃ ইউসুফ উদ্দীন ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২২২-২২৩।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৩।
২৯. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৪৯।
৩০. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।
৩১. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৫০।
৩২. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৫৫।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।
৩৭. ইবনে কুদামা ঃ খন্ড-৫, পৃঃ ১৬১।
৩৮. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৫৯-৬১।
৩৯. উদ্ধৃত করেছেন ঃ মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, পৃঃ ৬০।
৪০. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৬০।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

www.pathagar.com

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৪৭. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৫০।

৪৮. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৬৮–৭৩।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

৫১. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৫০।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫১।

৫৩. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৮।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

নবম অধ্যায়

১. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৫১।

২. কিতাবুল ফিক্‌হি আল মাযাহেবিল আরবায়া, পৃঃ ৬৭, ৭৪।

৩. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৫২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২–২৫৩।

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৩।

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৩।

৭. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২২।

৮. ডঃ ইরাজ টোটেনসিয়ান ঃ কম্প্যারেটিভ এনালাইসিস অব ইনভেস্টমেন্ট ইন ক্যাপিটালিস্টিক এ্যান্ড ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেমস আন্ডার সারটেইনিটি এ্যান্ড রিস্ক কন্ডিশনস, পেপার সাবমিটেড এ্যাট ফিফ্‌থ ইন্টারন্যাশনাল কোর্স ইন ইসলামিক ব্যাংকিং, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান, ট্রেনিং এ্যান্ড ম্যানপাওয়ার স্টাডিস ডিপার্টমেন্ট, অক্টোবর, ১৯৯৪, পৃঃ ৫।

৯. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২২।

www.pathagar.com

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

১২. বদর আল মুতাওয়াল্লী আব্দুল বাসেত ঃ আল ফাতাওয়া-আল শরীয়াহ ফিল মাসায়েল আল ইফতেসাদিয়াহ, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, পৃঃ ৬১।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১।

১৭. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪০।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

২১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬।

২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭-৭০।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

দশম অধ্যায়

১. ডঃ ইরাজ টোটেনসিয়ান ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

www.pathagar.com

৪. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইকোনমিক্স অব প্রোফিট শেয়ারিং ইন ফিসক্যাল পলিসি এ্যান্ড রিসোর্স এ্যালোকেশন ইন ইসলাম, সম্পাদনা ঃ জিয়াউদ্দীন আহমেদ, মনোয়ার ইকবাল ও ফাহিম খান, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনোমিক্স, কিং আবদুল আজীজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা এবং ইন্সটিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ, ইসলামাবাদ; ১৯৮৩,পৃঃ ১৬৭।

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।

৬. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১০৮।

৭. ডঃ ইরাজ টোটেনসিয়ান ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪।

৮. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১১১।

৯. আল-কুরআন ঃ ৭ : ৩১।

১০. বাদল মুখার্জী ঃ থিওরী অব গ্রোথ অব এ ফার্ম ইন জিরো ইন্টারেষ্ট রেইট ইকোনোমি,সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনোমিক্স,কিং আবদুল আজীজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা, ১৯৮৪ পৃঃ ৬৫-৬৬।

১১. ডঃ এম. ওমর চাপরা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১১৪।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

১৩. ডঃ ইরাজ টোটেনসিয়ান ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১ ।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

১৬. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৮৩।

www.pathagar.com